সাপ্তাহিক সংকলন

রেজি: ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-১৫ | সোমবার, ২৩ জুন ২০১৪, ০৯ আষাঢ় ১৪২১, ২৪ শাবান ১৪৩৫ | ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

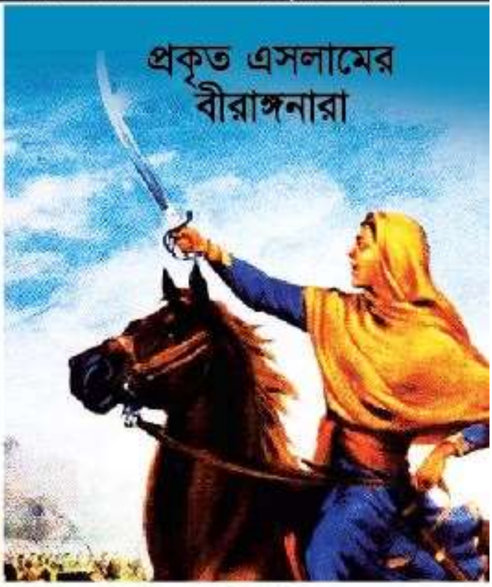

নারী নেতৃত্ব কি সত্যিই হারাম?

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ
দৈনিক দেশেরপত্র

সম্পাদকীয়

ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডূকতাই নারীদের পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে

এসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা পৃথিবীর আর কোন জীবনব্যবস্থা দিতে পারেনি। সহীহ হাদিস, রসুলাল্লাহ ও আসহাবদের জীবনী লক্ষ্য করলে এসলামে নারীর স্বাধীনতার বিস্তৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়ার বেড়াজালে জড়িয়ে বর্তমান সমাজে এসলামকে উপস্থাপন করা হোয়েছে নারীর অধিকার ক্ষুণ্নকারী একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে। ফলশ্রুতিতে মোসলেম সমাজে নারীরা আজ অবজ্ঞা, অবহেলার পাত্র। এসলামে নারীর প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ধর্মজীবীদের অজ্ঞতা বা কখনো জানা সত্ত্বেও সত্য গোপন করা, বিকৃত ফতোয়া দিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে তাদের বন্দি করে রাখা ইত্যাদি কারণে নারীরা এসলামের প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতাকামী নারীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাদের মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেদিকে ঝুঁকে পড়েছে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নারীর যে অধঃপতন হোয়েছে তার জন্য ধর্মব্যবসায়ীরা অনেকাংশেই দায়ী। এসলামের আগমন ঘটার আগে আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নারীদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হত না। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেত। অনেক সময় তারা সদ্যজাত কন্যা শিশুকে মাটিচাপা দিয়ে দিত। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীর চরম অবমাননার এই যুগে এসলাম এসেছিল নারীর মুক্তির বার্তা নিয়ে। নারীকে দিয়েছিল পূর্ণ মর্যাদা, অধিকার আর স্বাধীনতা। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রের সর্বত্র নারীর অবাধ বিচরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এসলাম যা আজ থেকে এক শতাব্দী আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও ছিল অচিন্ত্যনীয়। আজ ধর্মব্যবসায়ীরা নারী নেতৃত্বকে হারাম কোরে রেখেছেন। কিন্তু তাদের এই ফতোয়া কি সত্যিই আল্লাহ এবং রসুলের সিদ্ধান্তের প্রতিফলন? মোটেই নয়। এসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে শালীনতার হুকুম দিয়েছে কিন্তু তার মানে কি এই যে নারীকে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে, কিম্ভুতদর্শন অবয়বে ঘর থেকে বের হতে হবে? মোটেই নয়। কিন্তু এ সব বিকৃতিই আজ সমাজের গভীরে দৃঢ়মূল হোয়ে আছে। স্বভাবতই এই অপ্রাকৃতিক শরিয়তের বিরুদ্ধে মোসলেম নারীর হৃদয় একসময় বিদ্রোহ করে উঠেছে। তারা প্রকৃত এসলামের রূপ সন্দর্শন করে নি, মানবাধিকার লংঘনকারী নির্যাতনমূলক পর্দাপ্রথাকেই তারা ভেবেছে এসলামের বিধান। এই অন্যায়ের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা খোদ এসলামকেই নিস্পেষণের কল বোলে মনে কোরছে। এর বিপরীত যে নগ্নতার সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দুনিয়া পৃথিবীর সামনে মেলে ধোরেছে অথবা চাপিয়ে দিয়েছে, সেই ব্যবস্থাকেই মোসলেম নারীদের অনেকেই মুক্তির পথ ভেবে লুফে নিয়েছে। সুতরাং আজ আমাদের নারীবাদী সমাজে যে আত্মিক অধঃপতন, বেহায়াপনা, অসভ্যতার সংস্কৃতি বাসা বেঁধেছে তার দায় এসলাম বিকৃতকারী ধর্মব্যবসায়ীরা এড়াতে পারেন না।

তবে নারী স্বাধীনতার জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের যে গুণগান আজ গাওয়া হোচ্ছে তার ফলাফলও বিবেচনায় আনা উচিত। এটা বাস্তবতা যে পাশ্চাত্য দেশগুলোতেই নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি। যে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনাকে 'আধুনিকতা'র মোড়কে স্বাধীনতা বলে মনে করা হচ্ছে তা নারীকে ইতোমধ্যেই মনুষ্যত্বের পর্যায় থেকে নামিয়ে প্রাচীন বর্বর যুগের মতই একটা ব্যবসায়ী পণ্যে রূপান্তরিত কোরে ফেলেছে। আমরা দৈনিক দেশেরপত্রের মাধ্যমে মানবজাতির সামনে তুলে ধোরছি প্রকৃত এসলামের বিধানের সুনিপুণ ভারসাম্য যা হাজার বছরের বিকৃত এসলামের কারাগার থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে তাকে নারী হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত কোরবে। এবং এই মর্যাদা কেবল এই লৌকিক জগতের নয়, পারলৌকিক জগতেও।

সূচিপত্র

নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য-২
নারী নেতৃত্ব কি সত্যিই হারাম?-৪
এবাদতে পুরুষদের সঙ্গে নারীদের অংশগ্রহণ- ৯
প্রকৃত এসলামে বিয়ে-১১
পশ্চিমা ভাবাদর্শের নারী এবং হেযবুত তওহীদের নারী-১২
ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে-১৫
'ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার নারী মুক্তির অন্তরায়' শীর্ষক আলোচনা সভা- ১৬
নারীর সামনে তৃতীয় পথ-১৮
জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে নারীদের কর্তব্য-২০
দেশেরপত্রের বিভিন্ন আয়োজনে মন্ত্রীগণ-২৩
মেয়ে হোয়ে কেন পত্রিকা বিক্রি করো?-২৫
মহিয়সী নারী আম্মা খাদিজা (রা:)-২৬
কবিতা- ঘুমিয়ে কেন এ দুঃসময়ে? ২৮
মনুসংহিতায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা-২৯
কবিতা- আধুনিকতার কুসংস্কার -৩১
নব সভ্যতার তূর্যবাদক যামানার এমামের আবির্ভাব-৩২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: রুফায়দাহ পন্নী
প্রকাশক : এডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpattro13@yahoo.com

নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য

রিয়াদুল হাসান

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানকে উল্লেখ না কোরে কোন উপায় নেই। অধিকাংশ মহৎ কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার পুরুষ সগৌরবে গ্রহণ করলেও তার সাফল্যের জন্য পর্দার অন্তরালে থেকে নীরবে কাজ কোরে গেছে কোন না কোন নারী, অন্ধ সমাজের দৃষ্টি খুব কমই সেই নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই নারী হয়তো মা, হয়তো স্ত্রী, হয়তো বোন, হয়তো বা কন্যা। নজরুল লিখেছেন:

কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

কোনো স্বীকৃতি তো নেইই- উল্টো আজকের এই সভ্যতার মুখোস পরা সমাজে নারীরা পদে পদে হোচ্ছেন নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হোচ্ছে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা। কেন? এটাতো হওয়ার কথা ছিল না। আজকের সমাজ যেন ১৪০০ বছর আগের আরবের সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। সে সময় কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা লজ্জাস্কর পরিস্থিতিতে পড়ে যেত। অনেকে সদ্যজাত কন্যা শিশুকে মাটিচাপা দিয়ে দিত। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীর চরম অবমাননার এই যুগে এসলাম এসেছিলো নারীর মুক্তির বার্তা নিয়ে। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রের সর্বত্র নারীর অবাধ বিচরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা কোরেছে এসলাম যা আজ থেকে এক শতাব্দী আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও ছিল অচিন্তনীয়। সেই বর্বরতার যুগকে স্বর্ণযুগে পরিণত কোরেছিলেন আল্লাহর শেষ রসুল। না। কোন মন্ত্রবলে নয়। আল্লাহ তাঁর কাছে যে জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছিলেন সেটা বাস্তবায়নের ফলেই অর্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল চূড়ান্ত ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও অনাবিল শান্তি। সেই এসলাম আর আজকের এসলাম এক নয়। এ কারণে তার ফলও সম্পূর্ণ বিপরীত, চরম অশান্তি। মাননীয় এমামুয্যামান, জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কোর'আন হাদীস ও ইতিহাস থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ কোরেছেন যে সেই এসলাম বিকৃত হতে হতে এখন চূড়ান্ত বিকৃত, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে।

নারী ও পুরুষ মানবজাতির মধ্যে দু'টি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সৃষ্টি। তাদের উভয়কেই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে সৃষ্টি কোরলেও তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পৃথক। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টির পর জান্নাতের অঢেল সুখ ও শান্তিময় পরিবেশে বসবাস কোরতে দিলেন। সেখানে তাঁর ছিল যেখানে খুশি যাওয়ার, যা খুশি খাওয়ার, যা খুশি করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। এত কিছু পেয়েও আদম (আ:) এর হৃদয়ে বিরাজ কোরছিল এক অদ্ভুত শূন্যতার অনুভূতি। জান্নাতের এত সুখ-সম্ভোগ ও রঙ-রূপ-রসও তাঁকে আনন্দ দিতে পারছিল না, সব কিছু অর্থহীন, বিবর্ণ, নিরস মনে হোচ্ছিল। তখন আল্লাহ তাঁরই পাঁজড়ের হাড় থেকে সৃষ্টি কোরলেন তাঁর সঙ্গিনী এবং সাহায্যকারী হাওয়াকে (বাইবেল- জেনেসিস ২:২২)। মা হাওয়াকে পেয়ে শান্তির সুধারসে আদমের হৃদয় পূর্ণ হোয়ে গেল। এরপর আল্লাহর একটি হুকুম অমান্য করায় আল্লাহ তাঁদের উভয়কে শাস্তি-স্বরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। শাস্তি হোল, পুরুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার কোরে পরিবারের ভরণপোষণ করবে আর নারী গর্ভযাতনা সহ্য কোরবে, সন্তান লালন পালন কোরবে (বাইবেল- জেনেসিস ৩:১৬-১৭)। আল্লাহর প্রতিনিধি বা

খলিফা হিসাবে তাদের উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য আল্লাহ ঠিক কোরে দিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেবল পারিবারিক জীবনেই নয়, জীবনের সর্ব অঙ্গনের জন্য আল্লাহ নারীকে পুরুষের সঙ্গী এবং সাহায্যকারী হিসাবে নির্ধারণ কোরে দিলেন। তিনি নারীকে সৃষ্টিই কোরেছেন রহমত, বরকত ও নেয়ামতে পূর্ণ কোরে। এজন্যই আল্লাহ বোলেছেন, "আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া।" (আর-রূম ৩০:২১) আর আল্লাহর রসুল বোলেছেন, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর নেয়ামত আর সম্পদরাশিতে পূর্ণ এবং সেই সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে মঙ্গলময় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও নেয়ামত হোচ্ছে সেই স্ত্রী যে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি সদা সতর্ক (সহীহ মোসলেম, ২য় খণ্ড ৩৪৫৬)। এই হোচ্ছে নারীকে আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টিগত মর্যাদা।

নারী কেবল তার স্বামীর জন্য শান্তির প্রতিমূর্তি নয়, জান্নাতকে যেভাবে সে শান্তিময় কোরে তুলেছিল, ঠিক সেভাবে মানবসমাজের প্রতিটি অঙ্গনের যেখানেই সে যাবে সেখানেই সে শান্তির সুবাস ছড়িয়ে দেবে। সে মা হিসাবে সন্তানের জন্য মমতার আশ্রয়, বোন হিসাবে ভাইয়ের জন্য আদরিনী আর স্নেহের আধার, স্ত্রী হিসাবে সে স্বামীর জন্য প্রেমময়, ঘরের কর্ত্রী, বার্ধক্যের অবলম্বন। কন্যা হিসাবে সে পিতা-মাতার জন্য নিরন্তর আনন্দের ফল্গুধারা। যে ঘরে, সমাবেশে, যে কর্মকাণ্ডে নারী নেই সেটা প্রাণহীন। তাদের আগমনেই মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গন শান্তিময় হোয়ে উঠবে। সেই নারীদেরকে আজ কোথায় নিয়ে যাওয়া হোয়েছে? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে কি তার পক্ষে সম্ভব নয় একটি প্রস্ফুটিত গোলাপকে জুতার তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে? অথচ আজ অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শান্তির উৎস যে নারী, সেই নারীকে আজ দাসী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাদের উপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। এই অবস্থার সূত্রপাত কোথায়?

আদমের (আ:) পর থেকে পৃথিবীতে যখন মানুষের বিস্তার হোল আল্লাহ তাদের শান্তিতে জীবনযাপনের জন্য নবী রসুলদের মাধ্যমে তাঁর বিধান পাঠাতে থাকলেন। সেই বিধানগুলি মানুষ যখন মেনে চোলত তাদের সমাজে অনাবিল শান্তি বিরাজ কোরত। কিন্তু নবীদের প্রস্থানের পর একটি শ্রেণির জন্ম হোয়েছে প্রতিটি জাতির মধ্যে যারা ঐ বিধানের অর্থাৎ ধর্মের ধারক বাহক সেজে বসেছে। তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর বিধানকে বিকৃত কোরে ভারসাম্যহীন কোরে ফেলেছে। ফলে ধর্মই হোয়ে দাঁড়িয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতনের কল। সেই বিকৃত বিধানের ফলে সমাজের শান্তিময় পরিবেশ বিনষ্ট হোয়েছে। কোমলমতি নারীরা স্বভাবতই সামাজিক নিষ্ঠুরতার প্রথম শিকারে পরিণত হোয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্নেহবঞ্চিত নিরাশ্রয় নারীকে রুজি রোজগারের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কাজের দিকে, প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার দিকে ঠেলে দেয়। যে কাজগুলি তার দেহ কাঠামো ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলি করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তার চরিত্রে কোমলতার বদলে আসে পুরুষালী রুক্ষতা, তার কাঁন্নুর কণ্ঠ হোয়ে যায় কর্কশ, নারী তার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য হারায়। গত ৪ জুন ডেইলি স্টার পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, আমাদের গ্রাম বাংলার অনেক নারী কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুরী কোরছেন। একজন পুরুষ দিনমজুর সারাদিন রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যে পরিশ্রমের কাজগুলি করেন একজন নারী দিনমজুরও সমান পরিশ্রমের কাজ করেন। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ প্রতিবেদক এটা লেখেন নি এই নারীরা নারী হিসাবে তাদের যে জীবন প্রাপ্য ছিল তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, পাশাপাশি পুরুষালি কাজগুলি করে তারা তাদের নারীসুলভ চারিত্রিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি হারাচ্ছেন। এর জন্য কেবল দারিদ্র্যই দায়ী নয়।

'আধুনিক' পশ্চিমা সমাজের নারী পুরুষরা এখন মানুষের জীবন বাদ দিয়ে জীবজন্তুর মত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জীবন বেছে নিয়েছে। দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র বস্তুবাদী জীবনের আকর্ষণ, সম-অধিকার, স্বাধীনতা জাতীয় প্রহেলিকামূলক মতবাদ, আর্থিক উৎকর্ষের পেছনে ছুটে ছুটে আমাদের নারী সমাজের বড় একটি অংশও তাদের সৃষ্টিগত আত্মিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হারিয়েছেন, তাদের সৌন্দর্য্য, করুণা, দয়া-মায়া, শিষ্টাচার, নম্রতা, লাজ-লজ্জা সবই প্রায় খুইয়েছেন। তবে এটা অনস্বীকার্য যে নারীর এই বিবর্ণতার পেছনে প্রধান কারণ পুরুষ সমাজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

এসলামের সকল বিষয় যেমন বিকৃত হয়ে গেছে তেমনি সমাজে নারীর অধিকার, সম্মান, দায়িত্ব, কাজের আওতা সম্পর্কে সঠিক ধারণাও হারিয়ে গেছে। ধর্মের নামে তথাকথিত আলেম সমাজ জবরদস্তিমূলক একটি অপ্রাকৃতিক ব্যবস্থা নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে চাইছে। একটি জাতির মধ্যে অর্ধেকই নারী, কাজেই অর্ধেক জনসংখ্যাকে ঘরে বন্দী করে রেখে, অন্তর্মুখী করে রেখে কোন জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। এক পা ছাড়া যেমন হাঁটা যায় না, তেমনি অর্ধেক জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে জাতির উন্নতি প্রগতির সকল প্রচেষ্টাই মুখ থুবড়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

নারী নেতৃত্ব কি সত্যিই হারাম?

আল্লাহর রসুলের নারী আসহাবরা অবলা ছিলেন না। তারা যুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতিতে অস্ত্রহাতে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

মানবজাতিকে আল্লাহ সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষের মূল দায়িত্ব হোচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই মানুষের মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু'টি সৃষ্টি - নারী ও পুরুষ। শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠনে এদের উভয়েরই স্রষ্টা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রোয়েছে। সেই দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন কোরেই মানবসমাজ যাত্রা শুরু করে। যে বিধান একটি পরিবারের মধ্যে প্রযোজ্য তা দিয়ে রাষ্ট্র চোলতে পারে না, আবার রাষ্ট্রের আইন দিয়ে পরিবার চোলতে পারে না। এই উভয় অঙ্গনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতেই হবে। সেই ব্যবস্থাগুলি আল্লাহ তাঁর প্রেরিতদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানবজাতিকে দান কোরেছেন। আল্লাহ-প্রদত্ত এই ব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে এর নিখুঁত ভারসাম্য। আত্মিক চরিত্র ও জাগতিক বিধান উভয়ের বিস্ময়কর সমন্বয়ে গঠিত এই সনাতন, শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। মানবসমাজের এই ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এবলিস প্ররোচনা দিয়ে এই দীনের ভারসাম্য বিনষ্ট কোরেছে। ফলে মানুষ ভুলে গেছে কার কি কর্তব্য ও স্রষ্টা নির্ধারিত দায়িত্ব। দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা হোতে বাধ্য। তাই অন্যায় অবিচারে ডুবে গেছে মানুষ। আল্লাহ আবার কোন নবী রসুল পাঠিয়ে সেই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। এভাবেই মানবজাতি লক্ষ লক্ষ বছর পার হোয়ে, একটার পর একটা যুগ অতিক্রম কোরে শেষ যুগে এসে উপনীত হোয়েছে। বর্তমানের ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (দাজ্জাল) মানুষের জীবন থেকে সর্বপ্রকার নৈতিকতার শিক্ষাকে বিলুপ্ত কোরে দিয়েছে এবং স্রষ্টা ও আখেরাতের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্ছেদ কোরে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নারী ও পুরুষের কার কী অবস্থান, কার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য তা মানুষ একেবারেই ভুলে গেছে। সকল ধর্ম বিকৃত হোয়ে যাওয়ার কারণে এ বিষয়ে স্রষ্টার দেওয়া মানদণ্ডও দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে। প্রচলিত বিকৃত এসলামে নারী পুরুষের সঠিক অবস্থান নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সকল আলেমই "সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াত"কে ভিত্তি হিসাবে উপস্থাপন করেন।

"আর-রাজালু কাওয়্যামুনা আলান্নাসায়ী" - এ আয়াতটি পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব বিস্তারের পর থেকে কোর'আনের অন্যতম আলোচিত আয়াত। দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' এ আয়াতটিকে এসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার কোরে থাকে। এ আয়াতটির অনুবাদ করা হয়, "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য কোরে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।" [সুরা নিসা: ৩৪]

এসলামকে পশ্চাদপদ, নারীবিদ্বেষী মতবাদ, এসলাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কায়েম কোরতে চায় ইত্যাদি পশ্চিমা গৎ বর্ণনা কোরতে কোরতে নারীবাদীরা মাইক্রোফোন সিক্ত কোরে ফেলেন, তারা তাদের

বক্তব্যের পক্ষে এই আয়াতের উল্লেখ করেন। অপরদিকে কূপমণ্ডুক, খ্রিস্টানদের শেখানো বিকৃত এসলামের ধ্বজাধারী মোল্লারা নারীদের ক্ষমতায়নের বিরোধিতা কোরতে আশ্রয় নেয় এই আয়াতটির। আসুন আমরা এই শতবর্ষী বিতর্কের একটি বিরাম চিহ্ন টানি।

নারী-পুরুষের মূলকাজ তাদের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিশীল:

পরিবার হোচ্ছে মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন। এই আয়াতে এসলামে নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত পরিবারে কার কি অবস্থান, অধিকার ও কর্তব্য সে সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষিত হোয়েছে। এসলামের দৃষ্টিতে নারী কোন ভোগ্যবস্তু নয়, দাসীও নয়। এই আয়াতে আল্লাহ পুরুষের ক্ষেত্রে বিশেষণ ব্যবহার কোরেছেন 'কাওয়্যামুনা'। শাসক, কর্তৃত্বের অধিকারী, আদেশদাতা, ক্ষমতাশালী, নেতৃত্বের অধিকারী, Authority Power ইত্যাদি বোঝাতে আরবিতে আমীর, সাইয়্যেদ, এমাম, সুলতান, হাকীম, মালিক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখন আসুন দেখি আল্লাহ এসব কোন শব্দ ব্যবহার না কোরে 'পুরুষ নারীর কর্তা' বোঝানোর জন্য আল্লাহ 'কাওয়্যামুনা' শব্দটি কেন ব্যবহার কোরলেন। আল্লাহ কোন যুক্তিতে এবং কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল কোরেছেন তা এর অর্থের মধ্যেই নিহিত রোয়েছে। কাউয়ামুনা শব্দের অর্থ হোচ্ছে সুঠাম ও সুডৌল দেহবিশিষ্ট, মানুষের গঠন কাঠামো, ঠেক্‌না, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, শাসক, নেতা (আরবি-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃ ৫৩১- ই.ফা.বা.)। সুতরাং এই আয়াতের মর্মার্থ হোচ্ছে, পুরুষ শারীরিক দিক থেকে নারীর চেয়ে শক্তিশালী, তার পেশী, বাহু, হাড়ের গঠন, মেরুদণ্ড এক কথায় তার দেহকাঠামো নারীর তুলনায় অধিক পরিশ্রমের উপযোগী, আল্লাহই তাকে রুক্ষ পরিবেশে কাজ কোরে উপার্জন করার সামর্থ্য বেশি দান কোরেছেন, তাই পুরুষের দায়িত্ব হোল সে পুরুষ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ কোরে, কঠোর পরিশ্রম কোরে রোজগার কোরবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভূমি কর্ষণ কোরে ফসল ফলিয়ে, শিল্পকারখানায় কাজ কোরে উপার্জন কোরবে এবং পরিবারের ভরণপোষণ কোরবে। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরুষকে আল্লাহ নারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন, নারীর অভিভাবক কোরেছেন। এটা মানব সমাজে বিশেষ কোরে পরিবারে পুরুষের বুনিয়াদি দায়িত্ব। অপরদিকে নারীদেরকে আল্লাহ সন্তান ধারণের উপযোগী শরীর দান কোরেছেন, সন্তানবাৎসল্য ও সেবাপরায়নতা দান কোরেছেন। তাই প্রকৃতিগতভাবেই তাদের মূল কাজ হোচ্ছে সন্তানধারণ করা, তাদের লালন-পালন করা, রান্না-বান্না করা এক কথায় গৃহকর্ম করা। পবিত্র তওরাতেও নারী ও পুরুষের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যা পবিত্র কোর'আনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আদম (আ:) ও হাওয়া আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় আল্লাহ তাদের উভয়কে শাস্তিস্বরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। তওরাতের বর্ণনা: "আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকটিকে বোললেন, "আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব কোরবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব কোরবে।" তারপর তিনি আদমকে বোললেন, "যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ কোরেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটি অভিশপ্ত হোল। সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম কোরে তবে তুমি মাটির ফসল খাবে। তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেতের ফসল। যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরি করা হোয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধূলার দেহ ধূলাতেই ফিরে যাবে।" (তওরাত: জেনেসিস: ১৬-১৯)।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে স্বামী শব্দের অর্থ দেওয়া হোয়েছে পতি, ভর্তা, প্রভু, মনিব, অধিপতি, মালিক।

নারীদের গড়ন এই কাজের উপযোগী নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনব্যবস্থা আমাদের সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হোয়েছে তা নারীকে অমানবিকভাবে এবং বর্তমানের অনিরাপদ পরিবেশেও পরিশ্রমসাধ্য কাজ কোরতে বাধ্য কোরছে।

আল্লাহর একটি সিফত হোচ্ছে রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ যেমন কোন প্রাণী সৃষ্টি করার আগেই তার রেজেকের বন্দোবস্ত কোরে রাখেন, কেবল আহার্য নয় জীবনোপকরণ হিসাবে তার যখন যা দরকার তাই তিনি নিরন্তর সরবরাহ কোরে যান। তিনিই মানুষসহ প্রতিটি প্রাণীকে অস্তিত্ব প্রদান করেন, প্রাণদান করেন, প্রতি নিঃশ্বাসে তাকে অক্সিজেন সরবরাহ কোরে যান, আলো, পানি, বায়ু সবকিছুই তিনি তার বাধ্য-অবাধ্য নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে প্রদান কোরে যান। বিশ্বজগতে প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর যে ভূমিকা, একটি পরিবারে আল্লাহরই প্রতিভূ (খলিফা) হিসাবে পুরুষেরও অনেকটা সেই ভূমিকা। তা হোল ক্ষুদ্র পরিসরে, ক্ষুদ্র একজন প্রতিপালক হিসাবে তার স্ত্রী ও পরিবারভুক্ত সকলের জাগতিক প্রয়োজনসমূহ পুরণ কোরে যাওয়া, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলি যোগান দিয়ে যাওয়া।

প্রথম সারি-দ্বিতীয় সারি
(Front Line-Second Line):

যেহেতু উপার্জন করা পুরুষের কাজ, তাই বলা যায় জীবিকার যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েরা দ্বিতীয় সারির সৈনিক। কখনও কখনও যদি অবস্থার প্রয়োজনে নারীকে প্রথম সারিতে গিয়ে জীবিকার লড়াইতে অবতীর্ণ হোতে হয় সেটার সুযোগ আল্লাহ রেখেছেন। সুরা কাসাসের ২৩ নং আয়াতে আমরা দেখি, মুসা (আঃ) দেখলেন দুজন যুবতী মেয়ে কুয়ার কাছে তাদের পশুগুলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুসা (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে তারা অন্যান্য রাখালদের ভিড়ের কারণে নিজেদের পশুপালকে পানি পান করাতে পারছেন না। তখন মুসা (আঃ) তাদেরকে পানি তুলে দিলেন। মেয়েরা বোললেন যে তাদের বাবা অতি বৃদ্ধ, তাই তাদেরকেই এসব কাজ কোরতে হোচ্ছে। মুসা (আঃ) জানতে পারলেন যে, এই বৃদ্ধ পিতা হচ্ছেন শোয়াইব (আঃ)। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, পরিবারের পুরুষ যদি কোন কারণে উপার্জনের জন্য অক্ষম হন, তাহলে প্রয়োজনে নারীরাও উপার্জনের কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশ নিতে পারে। এছাড়া এসলামের বিধান হোল স্বামীর উপার্জনের উপর স্ত্রীর অধিকার রয়েছে কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনের উপর স্বামীর কোন অধিকার নেই। এখানেও নারীর উপার্জন করার অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কোরে নেওয়া হোল। রসুলাল্লাহর অনেক নারী আসহাব পরিবারে পুরুষ সদস্য না থাকায় বা পুরুষ সদস্যরা জেহাদে অধিক ব্যস্ত থাকায় নিজেরাই কৃষিকাজ কোরে, কুটির শিল্পের মাধ্যমে উপার্জন কোরতেন, অনেকে ব্যবসাও কোরতেন। রসুলাল্লাহর আহ্বানে সর্বপ্রথম যিনি এসলাম গ্রহণ করলেন তিনি একজন নারী, আম্মা খাদিজা (রাঃ)। তিনি তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়, মানবতার কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ ত্যাগের পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন। আবার এসলামের জন্য সর্বপ্রথম যিনি জীবন দিলেন, শহীদ হোলেন তিনি একজন নারী, সুমাইয়া (রাঃ)।

এবার আসা যাক সত্যিকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে। জেহাদ, সংগ্রাম করার জন্যই উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি। যে যোদ্ধা নয়, মোজাহেদ নয় সে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রাথমিক সদস্য হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। জেহাদের ময়দানেও প্রথম সারিতে (Front Line) থেকে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার দায়িত্ব পুরুষদের। এখানেও কারণ পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, শক্তি, সামর্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। জেহাদে নারীর স্বাভাবিক অবস্থান দ্বিতীয় সারিতে। প্রশ্ন হোল, জেহাদে এই দ্বিতীয় সারির কাজ কী?

দ্বিতীয় সারির কাজের মধ্যে সর্বপ্রথম হোচ্ছে রসদ সরবরাহ। যুদ্ধের বেলাতে রসদ সরবরাহকে যুদ্ধের অর্ধেক বোলে ধরা হয়। সৈনিকদের খাদ্য, পানি, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক উপাদান সরবরাহ, আহতদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে সোরিয়ে নেওয়া ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া, নিহতদেরকে দাফন করা ইত্যাদি সবই দ্বিতীয় সারির কাজ। রসুলাল্লাহর সময় নারীরা প্রায় সকল যুদ্ধেই প্রথমে এই দ্বিতীয় সারির দায়িত্ব পালন কোরেছেন। তারা আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন, নিহতদের দাফনে সহায়তা কোরেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদেরকে পানি পান কোরিয়েছেন। তাছাড়া মসজিদে নববীর এক পাশে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোয়েছিল,

পরিবারের পুরুষ যদি কোন কারণে উপার্জনের জন্য অক্ষম হন, তাহলে প্রয়োজনে নারীরাও উপার্জনের কাজে অংশ নিতে পারে।

মসজিদে নববীর এক পাশে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোয়েছিল, যার প্রধান ছিলেন একজন নারী রুফায়দাহ (রাঃ)।

যার প্রধান ছিলেন একজন নারী রুফায়দাহ (রাঃ)। যোদ্ধাদেরকে যদি রসদ ও এই সেবাগুলি দিয়ে সাহায্য না করা হয় তবে তারা কখনোই যুদ্ধ কোরতে পারবে না। তাই যে কোন সামরিক বাহিনীতে এই দ্বিতীয় লাইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু মেয়েরা কি সবসময় কেবল দ্বিতীয় লাইনেই থাকবেন? না। যুদ্ধে এমন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন মেয়েদেরকেও অস্ত্র হাতে নিতে হয়, সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হোতে হয় [সংসার সমরাঙ্গণেও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোলে নারীকেও প্রথম সারিতে অর্থাৎ উপার্জন ও পরিবার ভরণপোষণের কাজে নামতে হয়]। যুদ্ধক্ষেত্রের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে যেন মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারে এবং পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমানভাবে যুদ্ধ কোরে যেতে পারে সে সুযোগ আল্লাহ রেখেছেন। তার প্রমাণ ইতিহাস। ওহুদের যুদ্ধে যখন মোসলেম বাহিনী বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, বহু সাহাবী শহীদ হোয়ে যান, স্বয়ং রসুলাল্লাহ মারাত্মকভাবে আহত হন, কাফেররা প্রচার কোরে দেয় যে, রসুলাল্লাহও শহীদ হোয়ে গেছেন এমনই বিপজ্জনক মুহূর্তে মেয়েরা আর দ্বিতীয় সারিতে থাকলেন না, তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে রসুলাল্লাহকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাফের সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবী উম্মে আম্মারার (রাঃ) ভূমিকা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। এ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর (সাঃ) উক্তিই যথেষ্ট। তিনি বলেছিলেন, 'ওহুদের দিন ডানে-বামে যেদিকেই নজর দিয়েছি, উম্মে আম্মারাকেই লড়াই করতে দেখেছি।'

এর অনেক পরে ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদের (রাঃ) অন্যতম বাহু দেরার বিন আজওয়ার যখন শত্রুর হাতে আটকা পড়েন তখন তারই আপন ভগ্নী খাওলা ঘোড়ায় চড়ে এমন লড়াই শুরু করেন যে স্বয়ং সেনাপ্রধান খালিদ (রাঃ) বার বার জিজ্ঞেস করেন, "কে এই বীর?" খাওলা শত্রু শিবিরে আক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাইকে উদ্ধার করেই ছাড়েন। সত্যপ্রিয় পাঠকের বোঝার জন্য এ উদাহরণ দু'টিই যথেষ্ট যে, রসুলাল্লাহর সময়ে নারীরা প্রথম সারির ভূমিকাও কিভাবে পালন কোরেছেন। মাসলা মাসায়েলের জটিল জাল বিস্তার কোরে কোনকাজেই তাদের অংশগ্রহণের বাধা সৃষ্টি করা হয় নি। নারীর নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাকে এসলাম মোটেও অস্বীকার করে না। যদি অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন নারীকে দ্বিতীয় সারি থেকে প্রথম সারিতে আসতে হয় এবং সেখানে তিনি যদি তার জ্ঞান, প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ্যবলে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত বোলে সাব্যস্ত হন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি বহু পুরুষের উপরও নেত্রী হিসাবে নিয়োজিত হোতে পারবেন। উটের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা (রাঃ)। বহু সাহাবী তাঁর অধীনে থেকে যুদ্ধ কোরেছেন। যুদ্ধটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ঐতিহাসিকরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরেছেন, কিন্তু "এসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম" বোলে তখন তাঁর পক্ষে বিপক্ষে যুদ্ধরত কোন সাহাবী ফতোয়া দিয়েছেন বোলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর বিধান মতে কেবল একটি মাত্র পদ নারীকে দেওয়া বৈধ নয়, সেটি হোল- উম্মতে মোহাম্মদী নামক মহাজাতির এমামের পদ। আল্লাহ নারী ও পুরুষের দেহ ও আত্মার স্রষ্টা, সচেতন মন ও অবচেতন মনের স্রষ্টা। এদের উভয়ের দুর্বলতা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন মহান আল্লাহ। তিনি জানেন যে নারীর শারীরিক গঠন যেমন পুরুষের তুলনায় কোমল, তার হৃদয়ও পুরুষের তুলনায় কোমল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল। সহজেই তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, তার স্থৈর্য্য, দূরদর্শীতা পুরুষের চেয়ে কম, তাকে প্রভাবিত করা সহজতর। এবলিস নারীকেই প্রথম আল্লাহর হুকুম থেকে বিচলিত কোরেছিল। এ কারণেই আল্লাহর অগণ্য নবী-রসুলের মধ্যে একজনও নারী নেই। সুতরাং পৃথিবীময় উম্মতে মোহাম্মদী নামক যে মহাজাতি হবে সেই মহাজাতির

এমাম কেবল নারী হোতে পারবেন না, স্বীয় যোগ্যতাবলে অন্যান্য যে কোন পর্যায়ের আমীর বা নেতা সে হোতে পারবে। শুধু নারী হওয়ার কারণে কেউ নেতৃত্ব দিতে পারবে না এটা এসলামের দৃষ্টিতে যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপকাঠি নয়।

পারিবারিক বিধানকে জাতীয়করণ কোরতে চায় বিকৃত এসলামের আলেমরা

পুরুষ যেহেতু পরিবারের সবাইকে ভরন-পোষণ করাচ্ছে, লালন-পালন কোরছে কাজেই তার কথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে শুনতে হবে, এটা একটি পারিবারিক শৃঙ্খলা। কিন্তু পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত এই আয়াতটিকে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা কোরছেন ধর্মজীবী আলেম সমাজ। তাদের এই অপচেষ্টার ফলে নারী সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হচ্ছে না, তারা তাদের যোগ্যতার প্রমাণও দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোচ্ছেন। আজকের বিকৃত এসলামের কূপমণ্ডুক ধর্মজীবী আলেম-মোল্লারা সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াত উল্লেখ কোরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের অধীন কোরে রাখার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। তারা এটা বুঝতে সক্ষম নন যে, একটি পরিবার পরিচালনার শৃঙ্খলা দিয়ে রাষ্ট্র চোলতে পারে না, বা জীবনের অন্যান্য অঙ্গনগুলি চোলতে পারে না। জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে যার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বেশি সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তাকেই নেতা মনোনীত করা যাবে। সেখানে পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলাকে টেনে এনে অযোগ্য পুরুষকে নারীর কর্তা কোরতে হবে এমন সিদ্ধান্ত এসলাম সমর্থন করে না। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানে এক হাজার জন কর্মকর্তা, কর্মচারী আছে। সেখানে যদি জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতায় কোন নারী অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে সেখানে সেই নারীকে প্রধান অর্থাৎ নেতৃত্বদানকারী হিসাবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? সেই হিসাবে একজন নারী কোন এলাকার রাজনৈতিক প্রশাসকও (Governor) হোতে পারেন। আজকের বিকৃত এসলামের ধ্বজাধারীরা এসলামে পুরুষ ও নারীর অবস্থানকে এমনভাবে ভারসাম্যহীন কোরে ফেলেছে যে তারা নতমস্তক নারীদের গায়ে বোরকা চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের গৃহবন্দি কোরেছে, অপরদিকে পুরুষকে দিয়েছে স্বৈরশাসকের অধিকার। তারা একবারও ভাবে না যে উম্মতে মোহাম্মদীর নারীরা রসুলের পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ কোরলেন, এই রকম তাবুসদৃশ বোরখা গায়ে চাপিয়ে কি যুদ্ধ করা যায়, ঘোড়ায় চড়া যায়? বর্তমানে নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করাকেও মারাত্মক গোনাহের কাজ বোলে প্রচার করা হয়। এই সব মনগড়া, বুদ্ধিহীন, জাতিধ্বংসকারী ধারণাকে তারা এসলামের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে এবং এগুলির অনুকূলে হাজার হাজার বই লিখেছে, হাজার হাজার ফতোয়া ও মাসলা মাসায়েল বের কোরেছে। এই অন্ধত্ব আজ সমগ্র জাতির উপর জগদ্দল পাথর হোয়ে চেপে বোসেছে। তথাকথিত প্রগতিশীলরাও মোল্লা শ্রেণির এইসব মূর্খতাকে অসার প্রমাণ কোরতে গিয়ে আল্লাহ-রসুলকেই দোষারোপ কোরছে। তারা নিজেরাও পাশ্চাত্য জড়বাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের প্রভাবে অন্ধ হোয়ে আছেন। তাই এসলামের বিরোধিতা করা তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হোয়েছে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার জ্ঞান তাদের লুপ্ত হোয়ে গেছে। নইলে তারা বুঝতে পারতেন যে, এই ধর্মজীবী, ফতোয়াবাজ মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম মোল্লাদের সঙ্গে আল্লাহ রসুলের এসলামের কোন সম্পর্ক নেই, কেবল সম্পর্ক নেই নয়, এই মোল্লারা তাদের চাইতেও এসলামের বড় শত্রু।

উম্মতে মোহাম্মদীর নারীরা রসুলের পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ কোরেছিলেন। কিন্তু এই রকম তাবুসদৃশ বোরখা গায়ে চাপিয়ে কি যুদ্ধ করা যায়, ঘোড়ায় চড়া যায়?

এবাদতে পুরুষদের সঙ্গে নারীদের অংশগ্রহণ

রসুলাল্লাহর সময় নারী-পুরুষ উভয়ই একই সাথে সালাহ কায়েম ও হজ্ব পালন করতেন। আজও তারা একই সাথে হজ্ব করে কিন্তু মসজিদগুলি কার্যতঃ নারীর প্রবেশাধিকারই নেই।

আল্লাহ কোর'আনে বোলেছেন তোমরা সালাহ কায়েম কর। এখানে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের কথাই বোলেছেন। নারী-পরুষের ব্যাপারে আলাদা কোরে কিছু বলেন নাই। আবার রসুলাল্লাহর সময় নারী-পুরুষ উভয়ই একই সাথে হজ্ব পালন করতেন, এখনও করে। নারীরা জুম'আর সালাতে অংশগ্রহণ করতেন, এমনকি রসুলাল্লাহ বোলেছেন নারীদের মধ্যে যাদের সালাহ কোরতে সমস্যা আছে তারাও যেন জুম'আয় আসেন এবং মুনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। নারীরা কোরবানীতে অংশগ্রহণ করতেন। নারী-পুরুষ একসাথে রসুলাল্লাহর পেছনে সালাহ কায়েম করতেন, যেটা হেযবুত তওহীদ কোরে যাচ্ছে। অথচ বর্তমানে অনেক মসজিদে নারীদের প্রবেশাধিকারই নেই।

যে নারীরা যুদ্ধ কোরেছেন, সে নারীরা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন সালাহর মাধ্যমে। সামরিক বাহিনীর নারী সদস্যরা যে উদ্দেশ্যে এই প্যারেড বা কুচকাওয়াজের প্রশিক্ষণ নেন, সেই একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সামরিক চরিত্রের শৃঙ্খলা শিক্ষার জন্য এসলামে আল্লাহ সালাহ কায়েমের হুকুম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য আল্লাহ রাখেন নি। ছেলে ও মেয়েদের আলাদা জামাত করারও কোন প্রয়োজন নেই। তবে যে জামাতে সবাই মেয়ে সেখানে মেয়েরাই এমামতি কোরবে।

এসলাম পর্দাপ্রথার কঠোরতা সমর্থন করে না

আমাদের আলেম সাহেবরা যে ধরণের আপাদমস্তক আবৃতকারী পর্দাপ্রথা নারীদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন কোর'আন, হাদীস মোতাবেক এই ধরনের পর্দা কতটুকু বৈধ এবং নারীদের জন্য এটি বাস্তব সম্মত কি না। এখানে এসলামের একটি মূল নীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটা হোল, এই দীনে কোন জবরদস্তি নেই।

লা ইকরাহা ফিদ্দীন (সুরা বাকারা ২৫৬)।

সুতরাং কোন মানুষের উপরে কোন বিধান জোর কোরে চাপিয়ে দেওয়া এই দীনের নীতি-বিরুদ্ধ। যেহেতু এসলাম একটি প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা তাই এর সকল বিধানই মানুষের জন্য সহজসাধ্য হবে, ঠিক যেমন আলো, পানি, বাতাস মানুষ অনায়াসেই ব্যবহার করে থাকে। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে এখনও রাষ্ট্রের নির্ধারিত নিয়মে পর্দা করা না হোলে প্রকাশ্যে লাঠিপেটা পর্যন্ত করা হয় অর্থাৎ জবরদস্তি করা হয়। এর ফলে সে সব দেশের নারীরা ভিতরে ভিতরে এসলামের বিরোধী। কিন্তু কোনো মানুষ যদি কোন নির্দিষ্ট ধরণের পোশাক পরতে রাজী না থাকে, তাকে সেটা পরতে বাধ্য করা দীনের একটি নীতি ভঙ্গ করা। আল্লাহ কোর'আনে বহুবার তাঁর রসুলকে বোলেছেন, 'আমি আপনাকে দারোগা কোরে পাঠাই নি। আপনি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র।' (সুরা গাশিয়া ২১-২২)

আল্লাহ তাঁর রসুলকে বোলছেন, মো'মেন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনঅঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে। (সুরা নূর ৩১)

সুরা আহযাবের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বোলছেন, "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।

সুতরাং আল্লাহ নারীদের স্বাভাবিক প্রকাশমান অঙ্গসমূহ অর্থাৎ হাত, পা, মুখমণ্ডল খোলা রাখতে বোললেন যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় এবং বক্ষ ও গলদেশ বড় এক খণ্ড কাপড় দিয়ে আবৃত রাখতে বোললেন। সেখানে কিভাবে হাত, পা, নাক, মুখ এক কথায় আপাদমস্তক ঢেকে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি সেজে পর্দা করেন। চলুন এবার আমরা দেখি এটা কতটুকু যুক্তিসম্মত। বর্তমানের ন্যায় তাবুর মত ভৌতিক বোরকায় আবৃত হোয়ে ঘোড়ায় চড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি আদৌ সম্ভব? ওহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবী উম্মে আম্মারা (রা:) যে নজিরবিহীন ভূমিকা রেখেছিলেন সে সম্পর্কে রসুলাল্লাহ (সাঃ) বোলেছিলেন, 'ওহুদের দিন ডানে-বামে যেদিকেই নজর দিয়েছি, উম্মে আম্মারাহকেই লড়াই করতে দেখেছি।'

সেদিন উম্মে আম্মারা শত্রুর মোকাবেলা কোরেছেন, যুদ্ধ করেছেন, শত্রুর কবল থেকে রসুলাল্লাহকে মুক্ত কোরেছেন। কিন্তু সেদিন যদি উম্মে আম্মারা না থেকে সেখানে আজকের এই পর্দাবৃত মেয়েদের কাউকে রাখা হোত তাহলে কি তারা উম্মে আম্মারার মতো যুদ্ধ কোরতে পারতেন? পারতেন না, কাজেই এটা প্রমাণিত হোল যে রসুলের নারী আসহাবরা এভাবে পর্দা করতেন না। এখন জানা দরকার যে, এই বিকৃত পর্দা প্রথা কোথা থেকে আসল? এসলাম যখন বিকৃত হোয়ে গেল, তখন এই জাতির মধ্যে হাজার হাজার আলেম জন্ম নিল যারা এই দীনের প্রতিটি বিষয়কে চুলচেরা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরে মাসলা মাসায়েল আবিষ্কার কোরতে আরম্ভ কোরল। এভাবে তারা লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল ফতোয়া উদ্ভাবন কোরল যেগুলির সঙ্গে এই জাতির মূল কাজের কোনই সম্পর্ক নেই। কয়েক শ' বছর আগে এই জাতিটি যখন আল্লাহর শাস্তিস্বরূপ খ্রিস্টানদের পদানত গোলামে পরিণত হোল তখন ঔপনিবেশিকরা মোসলেমদের প্রকৃত এসলাম থেকে সরানোর জন্য একটি বিকৃত এসলাম তৈরি কোরল এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তা এই জাতিকে শেখালো। সেই মাদ্রাসার সিলেবাসে এই সব ব্যক্তিগত মাসলা-মাসায়েলের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হোল এবং জাতীয় জীবনের বিধানগুলির গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হোল। অন্যায়, অশান্তি, অবিচারের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বদলিয়ে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে শেখানো হোল। আর এই মাদ্রাসাগুলো থেকে বের হোয়ে তথাকথিত আলেম-মাওলানারা ধর্মব্যবসা কোরে খেতে শুরু কোরল, কারণ মাদ্রাসায় অন্য কোন উপায়ে রোজগার করার পদ্ধতি শেখানো হয় নি। এই ধর্মব্যবসায়ীরা তাদের ওয়াজ নসিহতে নারীদের সম্পর্কে বয়ান কোরতে কোরতে বর্তমানের এই বিকৃত পর্দাপ্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠা কোরে ফেলেছে। তারা একবারও খেয়াল কোরছে না যে, তারা যে বিধান নারীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সেটা তাদের জন্য কষ্টকর তো বটেই, সেট আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের হুকুম পরিপন্থী। সেটা এক প্রকার দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং জবরদস্তি যা করা আল্লাহর নিষেধ।

আকীদার বিকৃতির ফলে শুধু যে এসলামের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে তাই নয়, এর ছোটখাট উদ্দেশ্যও বিকৃত হোয়ে গেছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল মেয়েদের যে উদ্দেশ্যে হেযাব বা পর্দা করতে আদেশ দিয়েছেন তা হলো, আঁটশাট কাপড় পোরে, অর্ধনগ্ন হোয়ে যুবতী, তরুণী মেয়েরা ঘুরে বেড়ালে এ থেকে সমাজে নানারকম অন্যায়, অশান্তি সৃষ্টি হবে। এই অশান্তি যেন না হয় তাই ঐ হেযাবের আদেশ। এ কারণেই যেসব মেয়েদের বয়স বেশী হোয়েছে, যারা প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা হোয়েছেন অর্থাৎ যাদের দেখলে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হবে না তাদেরকে হেযাব করা থেকে রেহাই দেয়া হোয়েছে (সুরা নূর ৬০)। অথচ আজকাল পথেঘাটে দেখবেন প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা মা, দাদীরা কিম্ভুতকিমাকার বোরকায় আপদমস্তক ঢেকে আছেন আর তাদের সঙ্গে আধুনিক, মেকআপ করা অর্ধ নগ্না মেয়ে, নাতনীরা বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে পরদা করার আদেশ করা হোয়েছে তার ঠিক উল্টোটা করা হোচ্ছে।

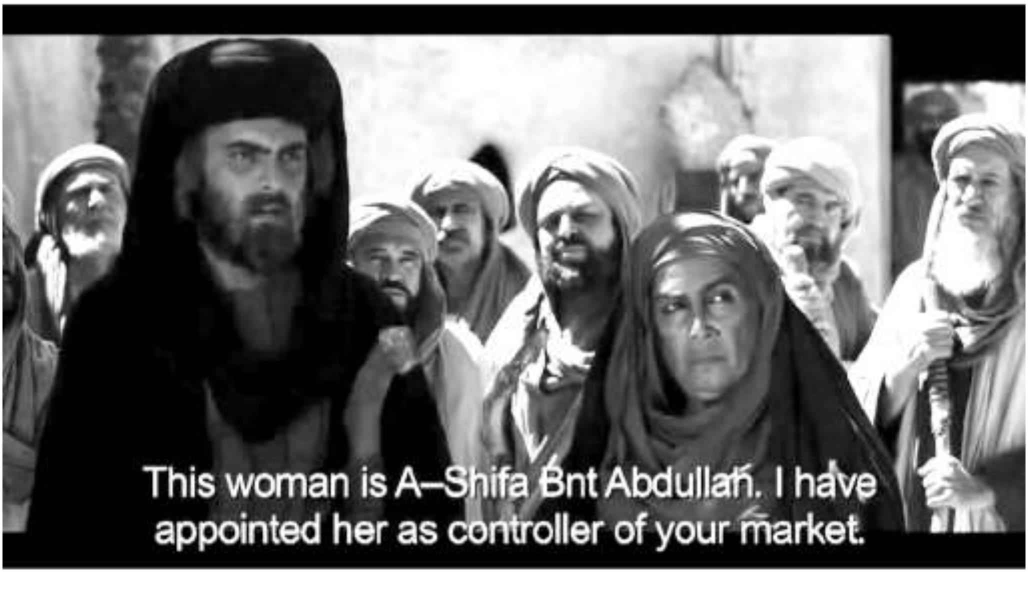

রসুলাল্লাহর নারী সাহাবীরা পুরুষ সাহাবীদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ কোরেছেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে সমানতালে অংশগ্রহণ কোরেছেন। উমর (রাঃ) এর সময় মদীনার বাজারের দায়িত্বশীল ছিলেন শেফা (রাঃ)

প্রকৃত এসলামে বিয়ে

এসলামের শরিয়ত মোতাবেক বিয়েতে তিনটি শর্ত অবশ্যপালনীয়- (১) ছেলে ও মেয়ের পূর্ণ সম্মতি [আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মোত্তাফেক আলাইহে], (২) দেনমোহর প্রদান করা (সুরা নেসা-৪), (৩) কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী রাখা। কিন্তু আমাদের সমাজে বিয়েগুলিতে লাখ লাখ টাকা দেনমোহর লেখা হয় কিন্তু সেগুলি কখনোই পরিশোধ করা হয় না। শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে না হলেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দু'জন বিবাহিত জীবন যাপন করে, সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়। উপরন্তু যৌতুককে শোষণ এবং নারী নিগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যৌতুক আদায়ের জন্য স্ত্রীর ওপর অবর্ণনীয় দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো এমনকি হত্যার ঘটনাও ঘটে। যৌতুক আদায়ের জন্য এসিডে ঝলসে দেওয়া হয় তাদেরকে, দিনের পর দিন অপমান লাঞ্ছনা সয়ে বেড়ানোর চেয়ে গলায় দড়ি বা বিষপানকেই মুক্তির পথ হিসাবে বেছে নেয় বহু নারী। তথাকথিত হাই সোসাইটিতেও যৌতুকের জন্য চলে ভিন্ন মাত্রার নির্যাতন। যৌতুক ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসুল (সা.)-এর সময় কিংবা পরবর্তীতে ইসলামী সমাজে কখনো যৌতুক চালু ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাননীয় এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের মধ্যে এসলামের প্রকৃত পদ্ধতির বিয়ে চালু কোরেছেন। হেযবুত তওহীদের ছেলেরা বিয়ের আসরেই কনেকে নগদ দেনমোহর পরিশোধ কোরে দেন, যৌতুক গ্রহণের তো প্রশ্নই আসে না। বিয়েতে অপব্যয় অনেক পাত্র-পাত্রীর পরিবারের জন্য কষ্টকর পরিণতি ডেকে আনে। সামাজিক সম্মান রক্ষার অজুহাতে অনেকে বিয়েতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। অথচ আল্লাহর রসুল বোলেছেন, সর্বাপেক্ষা বরকত-পূর্ণ বিয়ে হোল যা সর্বাপেক্ষা কম কষ্টে সম্পন্ন হয় (বায়হাকী)। তাই হেযবুত তওহীদের মধ্যে বিয়ের আয়োজন যতদূর সম্ভব সহজ ও সাধারণভাবে করার চেষ্টা করা হয়, তবুও এর পরিবেশ থাকে অত্যন্ত আনন্দঘন, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং অকৃত্রিম।

মাননীয় এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের মধ্যে এসলামের প্রকৃত পদ্ধতির বিয়ে চালু কোরেছেন। হেযবুত তওহীদের ছেলেরা বিয়ের আসরেই কনেকে নগদ দেনমোহর পরিশোধ কোরে দেন, যৌতুক গ্রহণের তো প্রশ্নই আসে না।

পশ্চিমা ভাবাদর্শের নারী এবং হেযবুত তওহীদের নারী

ধর্মব্যবসায়ীরা যেভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর অধিকার ও সম্মানকে ক্ষুণ্ন কোরে চোলেছেন তা নারীদেরকে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। অপরদিকে আছে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। টিভি স্যাটেলাইটের অশ্লীল সংস্কৃতি দেখে আমাদের মেয়েরা নিজেদেরকেও শোবিজ তারকা বলে কল্পনা কোরছে, তাদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, চালচলন ইত্যাদি অনুকরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা কোরছে। মা, নানী, দাদীদের মত বোরকা পরা তাদের কাছে মৃত্যুর মত। তারা তো জানে না যে, মা-দাদীদের ঐ পর্দার বাড়াবাড়ি ধর্মব্যবসায়ীদের আবিষ্কার। সঠিক পথ না পেয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ায় আজ নারী সমাজের যে অধঃপতন হোচ্ছে তার জন্য ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াবাজী অবশ্যই দায়ী। তার জানতে পারছে না যে, বর্তমানের এই প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানের যুগের ভিত্তি স্থাপন কোরেছিলেন স্বর্ণযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা। কেবল বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নয়, ভাস্কর্য্য নির্মাণ, স্থাপত্যবিদ্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গনে তারা শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোয়েছিল। অথচ আজ ধর্মজীবীরা খানকায় মারকাজে বসে ফতোয়া দেন, এসলামে গান শোনা নাজায়েজ, ভাস্কর্য্য নির্মাণ না জায়েজ, এমন কি বেগানা নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা পুরুষের জন্য হারাম, বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এত বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথ হিসাবে আমাদের নারী সমাজ পাশ্চাত্যের অবাধ জীবনযাপনের সংস্কৃতিকেই বেছে নিচ্ছেন। পশ্চিমাদের অনুসরণ কোরে আমাদের পরিবারগুলিতেও এখন কথায় কথায় ডিভোর্স একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেড়ে চোলেছে পশুর মত লিভ টুগেদার। এসবের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হোচ্ছে আমাদের সন্তানেরা। সমান অধিকার, সাবলম্বিতা, জীবনযাত্রার মানকে পশ্চিমাকরণ ইত্যাদির আশায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই রোজগারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হোয়ে যায়। সন্তানেরা অনাত্মীয় পরিবেশে নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে বড় হয়, তার কথা শোনার কেউ থাকে না, শাসন করারও কেউ থাকে না। তাদের সুষ্ঠু মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মানুষের জীবনের ভিত্তি যে পরিবার জীবন সেটা না থাকায় তাদের ভিতরে ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান জাগ্রত হয় না, বাবা-মায়ের স্নেহবঞ্চনায় তাদের সঙ্গে তৈরি হয় সীমাহীন মানসিক দূরত্ব। বড় হওয়ার এই সময়টাতে সঠিক পরিচর্যা না পেয়ে তারা হতাশাগ্রস্ত হোয়ে বিপথগামী হয়। পশ্চিমা সমাজে বাল্যকালেই তাদের সন্তানরা ব্যভিচারে ও মাদকে অভ্যস্ত হোয়ে পড়ে। মাদক ও ব্যভিচারকে সেখানে কোন অপরাধই মনে করা হয় না। আমাদের নারীবাদীরা নারীমুক্তির নামে কি এই নরকটাই কায়েম কোরতে চান? এসলাম একে সমর্থন করে না, কারণ এটা নারী বা পুরুষ কাউকেই শান্তি দেবে না। মানবজাতি যদি সত্যিই শান্তি চায়, তাদেরকে বর্তমানে প্রচলিত ভারসাম্যহীন বিকৃত এসলাম এবং ভারসাম্যহীন পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা দুটো থেকেই বেরিয়ে আসতে হবে। একদিকে পশ্চিমা সভ্যতা বিজ্ঞাপনী প্রচারণা ও অশ্লীল সংস্কৃতির দ্বারা নারীদেহকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত কোরেছে, অপরদিকে এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী নারীদেরকে ভুল বুঝিয়ে 'অমুক মার্কায় ভোট দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে' ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে ভোটব্যাংক হিসাবে ব্যবহার কোরতে চাইছে।

কিন্তু আমরা চাই নারীরা তাদের প্রকৃত অবস্থান বুঝে নিক এবং মানবতার কল্যাণে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান সংগ্রামে তারাও পুরুষের পাশাপাশি তাদের সমস্ত শিক্ষা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। হেযবুত তওহীদের মেয়েরা আন্দোলনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এমামুয্যামান সব সময় চেষ্টা কোরেছেন পুরুষদের পাশাপাশি যেন মেয়েরাও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। তারা মহানবীর সঙ্গে থেকে সেই বিস্ময়কর বিপ্লব সম্পাদনে যে ভূমিকা রেখেছেন তা এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের মোজাহেদাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ-রসুলের জীবন থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তাঁর নারী সাহাবীরা পুরুষ সাহাবীদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ কোরেছেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে সমানতালে অংশগ্রহণ

ধর্মজীবীরা ফতোয়া দেন, এসলামে গান শোনা নাজায়েজ, ভাস্কর্য্য নির্মাণ না জায়েজ, বেগানা নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম ইত্যাদি। এত বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথ হিসাবে আমাদের নারী সমাজ পাশ্চাত্যের অবাধ জীবনযাপনের সংস্কৃতিকেই বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমা সমাজের নারীরা কতটুকু শান্তিতে আছেন?

কোরেছেন। অথচ আজ বিকৃত অতি পরহেজগার নারীদের এই ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই। বর্তমান এসলামে যে নারী যতো আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে গৃহ-অভ্যন্তরে অবস্থান কোরবেন তিনি তত বড় পরহেজগার। হেযবুত তওহীদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সমস্ত রান্না মেয়েরাই কোরে থাকে। কেউ অসুস্থ হোলে তার চিকিৎসা, সেবাপ্রদান ইত্যাদি কাজে মেয়েরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

হেযবুত তওহীদের মেয়েরা শহরে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে তওহীদের বালাগ দিয়েছেন। মেলায়, মার্কেটে গিয়ে বই বিক্রী কোরেছেন, হ্যান্ডবিল বিতরণ কোরেছেন। তওহীদের বালাগ দিতে গিয়ে পুরুষদের সাথে অনেক মেয়েও হাসিমুখে জেল, জুলুম, ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামাদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য কোরেছে, ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হোয়েছে, নিজের ঘরবাড়ি ও পরিবার থেকে বহিস্কৃত হোয়েছে। অনেকে স্বামী, সন্তান, সংসার পর্যন্ত ত্যাগ কোরতে বাধ্য হোয়েছেন যেটা মহানবীর অনেক নারী সাহাবীর ক্ষেত্রেও হোয়েছিল। মানবজাতির কল্যাণের জন্য, মানবজীবনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা কোরে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জীবন ত্যাগ কোরে অনেক মেয়ে কঠিন সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ বরণ কোরে নিয়েছে। তারা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে এমামুয্যামানের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন, সালাহ্ কায়েম কোরেছেন। কখনও কখনও শুধু মেয়েদেরকে নিয়েও এমামুয্যামান আলোচনা কোরেছেন, সেখানে মেয়েরা তাদের পারিবারিক নানা সমস্যার বিষয়ের সমাধান এমামের কাছ থেকে শুনেছেন, নিজেদের দীন সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছেন। এ কথা ভুললে চোলবে না যে, জাতির প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। একজন মানুষের একটি পা কেটে ফেলে দিলে সে যেমন চোলতে পারে না, তেমনি এ জাতিটিও মেয়েদেরকে স্বেচ্ছায় গৃহনির্বাসন দিয়ে নিজেদের একটি পা-ই কেটে ফেলেছে। কবি নজরুল এজন্যই বোলেছেন,

"সে গৌরবের গোর হোয়ে গেছে আঁধারের বোরকায়
আঁধার হেরেমে বন্দিনী হোল সহসা আলোর মেয়ে,
সেইদিন হোতে এসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।"

আমরা বিশ্বাস কোরি, মানুষের চেয়ে বড় কোন সম্পদ নেই, যদি তারা ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাই আমরা বাংলার কোটি কোটি নারীকে ঐক্যবদ্ধ কোরতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা ধর্মব্যবসায়ীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছি, আমরা পশ্চিমাদের উশৃঙ্খল অসভ্যতাকেও প্রত্যাখান কোরেছি। আমরা চাই নারীরা নতুন বিশ্বসভ্যতা গড়ার সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অংশগ্রহণ কোরুক। এটাই এসলাম। হেযবুত তওহীদের মেয়েরা এই বিপ্লবের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে নিয়েছেন। তারা হকারি কোরে, পিঠা বিক্রি কোরে ইত্যাদি নানা কাজ কোরে পুরুষের পাশাপাশি উপার্জন কোরে যাচ্ছেন, তা দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন আবার আন্দোলনের কাজেও ব্যয় কোরছেন। তারাই আবার পুরুষের পাশাপাশি সভা সেমিনার কোরে, জনসভা কোরে মানুষকে সত্যের পথে ন্যায়ের পথে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের এই আহ্বানে বাংলার নারীরা যদি সত্য ও ন্যায়ের পথে ঐক্যবদ্ধ হন, তারা যদি বিকৃত এসলামের অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেন নব-সভ্যতার আলোকময় প্রাঙ্গণে, তারা যদি নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন মানবতার কল্যাণে- তাহোলে মহান আল্লাহর উপর ভরসা কোরে বোলতে পারি, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন অবহেলিত, অবজ্ঞাত এই বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ কোরবে, পৃথিবীতে আমরা হবো একটি পরাশক্তি, সারা বিশ্বকে আমরাই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবো এনশাআল্লাহ।

হেযবুত তওহীদের মেয়েরা আন্দোলনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। মাননীয় এমামুয্যামান সব সময় চেষ্টা কোরেছেন পুরুষদের পাশাপাশি যেন মেয়েরাও সকল কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

আগে আল্লাহর অধিকার সমুন্নত কোরতে হবে

পরিশেষে চূড়ান্ত কথা হোল, সব অধিকারের উৎস হোলেন মহান আল্লাহ। তিনিই মানুষের অধিকার বণ্টন করেন। তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের এবাদত হোল তাঁর বিধান দিয়ে মানবজাতিকে শাসন করা। তাঁর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোলেই মানুষের জীবনের সর্ব অঙ্গনে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন-আদালত, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় সর্ব অঙ্গনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের একমাত্র প্রভু ও বিধানদাতা হওয়ার হকদার একমাত্র আল্লাহ, তিনিই সমস্ত সৃষ্টিজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিমান কোরেছেন। সেই আল্লাহকে ছেড়ে আজ মোসলেমসহ সমগ্র মানবজাতি দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'-কে তাদের জাতীয় জীবনের এলাহ (হুকুমদাতা) হিসাবে মেনে নিয়ে তার পায়ে সেজদায় পোড়ে আছে। এমন অবস্থায় মোসলেম নামক এই জনসংখ্যার সর্বপ্রধান কর্তব্য হোচ্ছে আগে আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তবেই তাঁর সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রতিটি মানুষ তার সঠিক অধিকার বুঝে নিতে পারবে এবং নিজের কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে। একটি স্থূল উদাহরণ দিচ্ছি। ধোরুন আপনারা পাঁচ ভাই। আপনারা সবাই মিলে প্রবাসী পিতার জমি-জমা, ফল-ফলাদির বাগান, বাড়িঘরসহ সকল সম্পত্তি দেখাশোনা কোরছেন এবং ভোগ কোরছেন। আপনাদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই, একে অপরের বিরুদ্ধে ঝগড়া-ঝাটিতে লিপ্ত। আপনারা চান বাবার সম্পত্তি ভাগাভাগি কোরে আলাদা হোয়ে যেতে। আপনাদের আচরণে বাবাও চরম অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। আপনাদের এই অনৈক্যের সুযোগে কোনভাবে এক দুর্বৃত্ত বন্ধুবেশে এসে আপনাদের সকল সম্পত্তি দলিল কোরে নিলো। এবং ঘোষণা কোরে দিল, যে কোন দিন আপনাদেরকে উৎখাত কোরে দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে আপনাদের কী করণীয়। আপনারা কি ঐ বাড়ি, পুকুর, ফলের বাগান, ফসলী মাঠ ভাগাভাগি কোরবেন, নাকি সবাই ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আগে বাবার সম্পত্তি উদ্ধার কোরবেন? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কাজটিই কোরবেন কারণ বাবার সম্পত্তি উদ্ধার না কোরতে পারলে ঐ সব কিছুই কপালে জুটবে না, আপনার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকারই প্রযোজ্য হবে না। এই কারণেই পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত পারিবারিক জীবনের অধিকার, সামাজিক অধিকার, মানবাধিকার, নারী-অধিকার কোন কিছুই আপনি ভোগ কোরতে পারছেন না এবং কস্মিনকালেও পারবেন না, যতদিন না আল্লাহর সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার কোরছেন। এখন আপাতত আপনাদের একটাই কর্তব্য, জীবন সম্পদ সব দিয়ে আল্লাহর অধিকার, হক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে করা এবং এরই মধ্যে যতটুকু সম্ভব ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সদ্ভাব বজায় রেখে নারী-পুরুষ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ উপায়ে জীবন যাপন করা। কিন্তু উভয়েরই এখন মুখ্য কর্তব্য হোল আপ্রাণ সংগ্রাম কোরে এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরিবর্তন করা।

রসুলাল্লাহ ও প্রাথমিক খলিফাদের যুগে নারী ও পুরুষরা মসজিদে একত্রে বোসে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা কোরতেন। সেখানে নারীরা মুক্তভাবে তাদের অভিমত, পরামর্শ ব্যক্ত কোরতেন।

রাজধানীর পাবলিক লাইব্রেরিতে নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

-মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

'যারা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে নারী সমাজকে গৃহবন্দী করে রাখতে চায়, বিকৃত পর্দাপ্রথা চাপিয়ে দিয়ে নারীর স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে' বলে মন্তব্য করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। গত মঙ্গলবার বিকালে পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে দৈনিক দেশেরপত্রের উদ্যোগে 'ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার নারী মুক্তির অন্তরায়' শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন- 'আমাদের সমাজে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো নারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণতা। এই সমস্যাকে যদি আমরা ছোট করে দেখি তাহলে ভবিষ্যতে এর যথেষ্ট মাশুল গুনতে হবে। দেশ আরও পিছিয়ে যাবে। এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার মা-বোনরা।'

ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের ব্যাপারে তিনি বলেন- 'আজকে যারা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে মূলত তাদের মধ্যেই ঈমান নেই। তারা একদিকে বলে, মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত, মাকে সম্মান করতে হবে, মাকে কোনো কষ্ট দেয়া যাবে না ইত্যাদি, আবার অন্যদিকে দেখা যায় সেই মায়ের জাতিকেই বিভিন্ন জায়গায় তারা হেয় করছে। সবখানেই তাদের মধ্যে নারী সমাজকে বন্দী করে রাখার প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। পর্দাপ্রথার কথা বলে তারা আসলে যেটা ইসলামে নেই সেটাকে চালু করে ফেলেছে। আবার পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবেও নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য সর্বত্র বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। বলা হয়, তোমার এসব নিয়ে নাক গলানোর দরকার কী, তুমি মেয়ে মানুষ। সব কিছু তোমার বোঝার দরকার নেই। তুমি রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার কাজ কর ইত্যাদি। এই অবস্থা সৃষ্টির পেছনে ধর্মব্যবসায়ীরাই দায়ী।'

নারীমুক্তির অগ্রযাত্রায় সরকারের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন- 'বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনা সারা বাংলাদেশের নারীদেরকে ডাক দিয়েছেন তাদের অধিকার আদায় করার জন্য। তাদের এগিয়ে যাবার জন্য বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছেন। তাঁর এই মহতী উদ্যোগের বিরুদ্ধেও বহু অপপ্রচার করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, নারীরা স্বীয় যোগ্যতাবলে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীরা দায়িত্বপালন করছেন। অনেকে বলেন, একটা সময় আসবে যখন হয়তবা সেনাবাহিনীর প্রধানের পদও নারীকে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, অবশ্যই। নারীরা স্বীয় যোগ্যতাবলে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ট হতে পারে। বরং বর্তমানে পুরুষরা যে যোগ্যতাহীনতার পরিচয় দিচ্ছে তাতে হয়ত ভবিষ্যতে পুরুষদের জন্যই কোটার ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীশিক্ষার হার আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে।'

অর্থনীতিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন- 'এক সময় আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় ৯০০ ইউএস ডলারের মতো । কিন্তু আজকে আমাদের মাথাপিছু আয় ১১৯০ ইউএস ডলারের কাছাকাছি চলে এসেছে। ইদানিং উপার্জনকারী নারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। প্রায় ৪০,০০০ নারীরা এখন গার্মেন্টস এ কাজ করছে। আবার আজকে যে রেমিটেন্স আসছে, তার পেছনেও সিংহভাগ অবদান আছে নারীদের। আর সেই নারীদের যদি আমরা অবহেলা করি, যারা ধর্মের অপব্যাখা দেয় তাদের দ্বারা প্ররোচিত হই তাহলে আমাদের অগ্রগতি আবারও থমকে দাঁড়াবে।'

নারীমুক্তির লক্ষ্যে দেশেরপত্রের চলমান অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগকে শুধু এই হলরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবে না। আমাদেরকে ৬৪ হাজার গ্রামে গ্রামে ঢুকতে হবে, বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছতে হবে, তাহলে এনশাআল্লাহ আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে পারবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের যে লক্ষ্যে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এভাবে এগিয়ে গেলে আমরা ভিসন ২০২১ অর্জন করতে সক্ষম হবো এনশাআল্লাহ।'

দৈনিক দেশেরপত্রের উদ্যোগে রাজধানীর পাবলিক লাইব্রেরিতে

'ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার নারী মুক্তির অন্তরায়' শীর্ষক আলোচনা সভা

নারীর সামনে তৃতীয় পথ

রিয়াদুল হাসান

হেজাব মনপুত না হওয়ায় নারীর ওপর আফগান মুতাওয়ীন পুলিশের বেত্রাঘাত। আফগান, সৌদি আরবসহ বেশকিছু দেশে বাসার বাইরে মেয়েরা আপাদমস্তক আবৃত বোরকা পরে যেতে বাধ্য, না পরলে কঠোর শাস্তি। এই অবিচারকে এসলামের নামেই চালিয়ে দেওয়া হয়।

নারী ও পুরুষের কার কি অধিকার, কার কি কর্তব্য, কার কি সম্মান এ নিয়ে বিতর্কের কোন অন্ত নেই। এই বিতর্কের গোড়ার কারণ এগুলি নির্ধারণের কি মানদণ্ড হবে সেটাই আজও অনির্ধারিত। কেউ যদি পশ্চিমা সভ্যতাকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে তার কাছে ধর্মীয় অনুশাসনকে নিপীড়ন বোলে মনে হয়, আবার যারা যুগ যুগ ধোরে চোলে আসা সংস্কৃতিকে শ্রেয় জ্ঞান করেন তাদের কাছে পশ্চিমা উদারতাকে অসভ্যতা বোলেই মনে হয়। সমাজের যে শ্রেণিটি ধর্মের ধ্বজাধারী তারা ফতোয়ার কেতাব দেখে নারীকে বোলছে যে, 'তুমি নারী। তোমার জগত ঐ ঘরের চারদেয়াল। তুমি সেখানে থাকো, তোমার স্বামীর আসবাবপত্র পাহারা দাও। তুমি বাইরে যেয়ো না, তোমরা দেখতে তেঁতুলের মত। তোমাকে দেখে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি জাগ্রত হোয়ে যাবে, সমাজে অনাচার সৃষ্টি হবে। যদি একান্তই বের হও তবে স্বামীর সঙ্গে বের হবে, তখন তোমার সর্বাঙ্গ কালো বোরকায় আবৃত কোরে রাখবে যেন কেউ তোমাকে চিনতেও না পারে। নারীর কুমন্ত্রণায় পড়েই বাবা আদম গন্দম খেয়েছেন। তাই নারীই সকল অশান্তির মূল। নারী কখনো নেতা হোতে পারবে না, এটা তাদের জন্য হারাম। যে দেশের নেতৃত্ব নারীর কাছে সে দেশ আল্লাহর গজবে ধ্বংস হোয়ে যাবে।'

এই মোল্লা তান্ত্রিকতার বাস্তবায়ন যে সব দেশে করা হয় সেখানে আমরা কী ফল দেখতে পাই। যেমন ধরুন সৌদি আরব। সেখানে বাসার বাইরে মেয়েরা চোখ আর হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত আপাদমস্তক আবৃত কালো বোরকা পরে যেতে বাধ্য, না পরলে কঠোর শাস্তি। মুতাওয়ীন নামক বিশেষ ধর্মীয় পুলিশবাহিনী এই মাত্রার হেজাব নিয়ন্ত্রণ করে। বাড়ির বাইরে যেতে তাদেরকে সব সময় পরিবারভুক্ত একজন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে যেতে হয়, যে তার আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। সেখানে মেয়েদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। ২০১৩ সনে মেয়েদেরকে বাই-সাইকেল চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়, যথারীতি তাদের সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী থাকতে হবে, এবং যথযথ ড্রেসকোড পরেই সাইকেল চালাতে হবে। সেখানে মেয়েদের স্কুলগুলিতে কোন ক্রীড়াশিক্ষা দেওয়া হয় না, তাদের জন্য খেলাধুলাও বিহিত নয়। সৌদিতে নারীদের কোন রাজনৈতিক অধিকার নেই, এমন কি তাদের ভোটাধিকারও নেই। (অবশ্য ভ্যাটিক্যান সিটিতেও নারীদের ভোটাধিকার নেই, কিন্তু এ নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যাথা আছে বোলে মনে হয় না)। বর্তমানে সৌদি আরবে নারী শিক্ষার অনেক বৃদ্ধি (৮১%) পেলেও সেখানে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ, এমন কি ক্যাম্পাসের কোন পুরুষ লোক প্রবেশও নিষিদ্ধ। কিছুদিন আগে (৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪) ক্লাস চলাকালে একজন ছাত্রীর হার্ট অ্যাটাক হয়। সংবাদ পেয়ে রোগিনীকে নিতে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসে। কিন্তু স্কুলের স্টাফ অ্যাম্বুলেন্সকে গেটেই আটকিয়ে দেয় কারণ ড্রাইভার একজন পুরুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি পর্দাসহকারে মৃত্যুবরণ করে। ২০০২ সনে

মক্কায় অবস্থিত মেয়েদের একটি স্কুলে আগুন লেগে যায়। মেয়েরা প্রাণরক্ষার্থে ছুটে বেরিয়ে আসে কিন্তু 'মুতাওয়ীন' পুলিস তাদেরকে বেরোতে দেয় না, কারণ তারা নির্ধারিত ড্রেসকোড অনুসরণ করে নি। সেদিন ১৫টি মেয়ে অগ্নিদগ্ধ হোয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করে। আরবের অনেক দেশে ধর্ষিতা নারীকেও শাস্তিভোগ কোরতে হয়। মামলা মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে সাক্ষী হিসাবে নারীদেরকে পুরুষের অর্ধেক মর্যাদা দেওয়া হয়। তালেবান আফগানিস্তানে আরবের চেয়ে কঠোর ব্যবস্থা ছিল, সেখানকার নারীদের করুণ দুর্দশা আর নাই বা বোললাম। পাকিস্তানেও নারীরা যদি নিজেদের পছন্দের ছেলেকে পরিবারের অসম্মতিতে বিয়ে করে তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে পরিবারের সদস্যরাই। এমন 'অনার কিলিং' নামক বর্বরতা আরবেও কিছু কিছু গোত্রে প্রচলিত আছে যাকে ধর্মের নামেই চালানোর চেষ্টা করা হয়। মোট কথা যে সব দেশে বিকৃত এসলামের চর্চা যত বেশি সেখানে নারীদের দুর্দশা, অধিকারহীনতা তত চরম আকার ধারণ কোরেছে। এই অবস্থা একশত বছর আগে আরও ভয়াবহ ছিল। পশ্চিমা সভ্যতা 'দাজ্জাল' যখন নারীকে সম-অধিকারের প্রলোভন দেখালো, মুক্তির বাণী শোনালো তখন ধর্ম-নিষ্পেষিত নারীর কানে সেই বাণী সুমধুর হোয়েই বেজেছিল। কিন্তু সেই বস্তুবাদী 'সভ্যতা' নারীজাতির জন্য যে দানের পসরা নিয়ে এসেছে তার পরিণামে নারী কতটা মুক্তি পেল, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কতটা মানুষ অথবা ভোগ্য পণ্য হোয়ে উঠলো সেটা দেখা যাক।

পশ্চিমাসভ্যতা ধর্মের বিদ্রোহী। তার হাতে যে প্রগতিবাদিতার কুঠার তা দিয়ে সে 'ধর্ম নামক প্রাচীনযুগের কুসংস্কার'-কে টুকরো টুকরো কোরে ফেলতে চায়। সে বিশ্বনারীকে বোলছে, 'ধর্ম হোচ্ছে পুরুষদের তৈরি মনগড়া তত্ত্ব যা তারা নারীকে দাসী বানিয়ে রাখার জন্য তৈরি কোরে রেখেছে। তোমরা ধর্মের সব অনুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। তোমরা আন্দোলন কোরে তোমাদের সমান অধিকার আদায় কোরে নাও।' এভাবে একদিকে ধর্ম অন্য দিকে তথাকথিত আধুনিকতার আকর্ষণ এই দু'টি নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা কোরছেন আমাদের নারী সমাজ। যার ফল অবশ্যম্ভাবী পতন। আসলেই বিরাট এক উভয় সঙ্কট। প্রাচীনযুগ থেকে আমাদের সমাজে ধর্মের প্রভাব খুব গভীর। কিন্তু যারা ধর্মের ধারক ও বাহক তারা যে সব ধ্যান ধারণাকে ধর্মের নামে চালাচ্ছেন সেগুলি মেনে কি আদৌ চলা সম্ভব? সেগুলি কি মানুষের জন্য, নারীর জন্য কল্যাণকর? না। প্রচলিত ধর্ম সত্যিকার অর্থেই মানবপ্রগতির অন্তরায়। ধর্মকে বাদ দিলে থাকে পশ্চিমা সভ্যতার আহ্বান। কিন্তু সেটাই কি মানুষের জন্য কল্যাণকর? যে কোন পরিসংখ্যান দেখুন। কোথায় নারী নির্যাতনের হার বেশি, ধর্ষণ বেশি? হিসাব বলে যে সব দেশ পশ্চিমাদের অবাধ স্বাধীনতার সুখ ভোগ করার জন্য বেশি উদ্বেলিত হোয়েছে তাদের দেশেই নারীর অবমাননা, তাদের উপর নিগ্রহ নির্যাতন, পৈশাচিকতা অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে।

> মোট কথা একটি চিত্র পাওয়া গেলো যে পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত স্বাধীনতা, It's my life, 'আমি আমার মত' ইত্যাদি শ্রুতিমধুর বাক্যের বাস্তবায়ন কতটা নির্মম। সুতরাং মুসলিম নামধারী নারীদের সামনে দু'টি বিকল্প পথ: বিকৃত এসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিকতা। অতিরিক্ত রক্ষণশীল বিকৃত এসলাম নারীকে কোরেছে সেবাদাসী, পরাশ্রয়ী, অসূর্যস্পর্শা, অচল আর পশ্চিমা সভ্যতা তাকে বানিয়েছে ভোগের সামগ্রি, পণ্যের বিজ্ঞাপন। এ দু'টি যেন মৃত্যুবরণের দু'টি বিকল্প পন্থা।

সৌদি আরবে দেশের বিধিমোতাবেক বোরকা পরে নারীর সাইকেল চালানোর অনুমতি আছে তবে যথারীতি একজন পুরুষ আত্মীয় সঙ্গে থাকতে হবে।

⇨ বাংলাদেশে ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত চার বছরে মোট ধর্ষিতা হোয়েছেন ১২,৯৭১ জন, নির্যাতিতা হোয়েছেন ৬৭,২২৯ জন (বাংলাদেশ পুলিশ সদর দফতরের অপরাধ পরিসংখ্যান)।

⇨ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ফোর্বস এর প্রকাশিত 'Rape Every 20 Minutes For The World's Largest Democracy?'

শিরোনামের একটি প্রবন্ধে বলা হোয়েছে, ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো মোতাবেক সেদেশে প্রতি ২০ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। গ্রামাঞ্চল নয়, কেবল মেগাসিটিগুলিতে সংঘটিত সহিংসতাগুলির খণ্ডিত চিত্র এটি। কলঙ্কের ভয়ে, পারিবারিক লাঞ্ছনার আশঙ্কায় অধিকাংশ ধর্ষিতাই পুলিসের কাছে অভিযোগ করে না। আর ধর্ষণের অপরাধে সাজা পাওয়ার ঘটনাও বিরল। ২০১২ সনে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫৩ সনের তুলনায় ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯০২.১%।

➩ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ৬ জন নারীর একজন ধর্ষিতা বা আক্রমণের শিকার। সেখানে প্রতি দুই মিনিটে ১ জন নারী ধর্ষিতা হন। ৬০% ধর্ষণের ঘটনাই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয় না। গড়ে প্রতি বছর ২,৩৭,৮৬৮ জন নারী ধর্ষিতা হন যার ৪৪% এর বয়সই ১৮ বছরের নিচে। অভিযুক্ত অপরাধীদের ৯৭%-কেই এক দিনও জেলে থাকতে হয় নি।

➩ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নারী ধর্ষিতা হয় সুইডেনে। আশ্চর্য হোলেও সত্য যে এই ঘটনাগুলির ৫০%ই ঘটে পাবলিক প্লেসে।

পরিসংখ্যান ক্লান্তিকর বিষয়, তাই আর এগোচ্ছি না। মোট কথা একটি চিত্র পাওয়া গেলো যে পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত স্বাধীনতা, It's my life, 'আমি আমার মত' ইত্যাদি শ্রুতিমধুর বাক্যের বাস্তবায়ন কতটা নির্মম। সুতরাং মুসলিম নামধারী নারীদের সামনে দু'টি বিকল্প পথ: বিকৃত এসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিকতা। অতিরিক্ত রক্ষণশীল বিকৃত এসলাম নারীকে কোরেছে সেবাদাসী, পরাশ্রয়ী, অসূর্যম্পর্শা, অচল আর পশ্চিমা সভ্যতা তাকে বানিয়েছে ভোগের সামগ্রি, পণ্যের বিজ্ঞাপন। এ দু'টি যেন মৃত্যুবরণের দু'টি বিকল্প পন্থা।

এই দৃশ্যপটে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, মৃত্যুর বিপরীতে জীবনের দিকে আরেকটি পথ অঙ্কন কোরেছেন যামানার এমাম এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি কোর'আন হাদীস থেকেই প্রমাণ কোরে দিয়েছেন যে উপরে এসলামের নামে যে ভয়াবহতা তুলে ধরলাম সেটা আল্লাহ রসুলের এসলাম নয়। প্রকৃত এসলাম কেমন ছিল, সেখানে সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে নারীর কেমন অবাধ বিচরণ ছিল, মা হিসাবে জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি যুদ্ধের মাঠেও রসুলাল্লাহর নারী সাহাবীরা কী বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন তা তিনি উপস্থাপন কোরেছেন। সুতরাং নারী অধিকার, নারীর নিরাপত্তা, নারীর সম্মান সবকিছুই নিশ্চিত করে যে জীবনব্যবস্থা সেই জীবনব্যবস্থার প্রাঙ্গণে সকল নারীকে এসে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭] ■

জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে নারীদের কর্তব্য

রুফায়দাহ পন্নী

আমরা বাঙালি। আমাদের জাতির শত শত বছরের গৌরবময় ইতিহাস রোয়েছে। সেই ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সোপানে বিশেষ স্থান দখল কোরে আছেন বাঙালি নারীদের ভূমিকা। বিশেষ কোরে একাত্তরে নারীদের অবদান আজও আমাদেরকে দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করার শক্তি ও সাহস যোগায়। একাত্তরে আমাদের নারীরা পাক বাহিনী ও রাজাকারদের দ্বারা কেবল যে লাঞ্ছিতই হোয়েছেন তা নয়, তারা অস্ত্র হাতে পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধে বিরাট বিরাট অবদান রেখেছেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হোয়ে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার সামনে হানাদার শক্তি টিকতে পারে নি। বাঙালি জাতি সেদিন প্রমাণ কোরেছিল যে একটি জাতি যতোই দরিদ্র হোক, অবহেলিত হোক, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে। কিন্তু সেই ঐক্য আমরা ধোরে রাখতে পারি নাই। একাত্তরে যেমন এক শ্রেণির মানুষ ধর্মের নাম ও লেবাস ব্যবহার কোরে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ কোরেছিল, দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে গত ৪২ বছরে ধর্মকে ব্যবহার কোরে জাতির ঐক্যকে ধ্বংস কোরে জাতিকে বহুভাগে বিভক্ত কোরে দেওয়া হোয়েছে। এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার কোরছে। তারা ওয়াজ মাহফিল কোরে, বিভিন্নরকম ফতোয়া দিয়ে

যুগে যুগে ধর্মব্যবসায়ীদের নির্যাতনের পাত্র হোয়েছে নারীসমাজ।

জাতির অর্ধেক জনসংখ্যা নারীকে জাতীয় অঙ্গন থেকে বহিষ্কার কোরতে চেষ্টা কোরেছে। কেউ তাদের স্বার্থবিরোধী কাজ কোরলেই এই ধর্মজীবীরা তার বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট গড়ে তাকে নাস্তিক, কাফের বোলে ফতোয়া প্রদান করে। দেশের নব্বই ভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ। তারা এও বিশ্বাস করে যে, এই লেবাসধারী তথাকথিত আলেম-মোল্লারা ধর্মের কথা বলে, তারা যা বলে সবই ধর্মের কথা। তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে মিথ্যা ফতোয়া দ্বারা প্রভাবিত করে, এমন কি মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পর্যন্ত পাল্টে দেয়। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বোলছি। এই ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের মহিলাদেরকেও অপপ্রচারের কাজে লাগায় যারা সহজ-সরল মেয়েদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে, জান্নাতের লোভ দেখিয়ে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বলে। জান্নাত, আখেরাত ইত্যাদি ধর্মীয় কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সাহায্য করে। ধর্মের কথা বোলে অধর্ম করার সুযোগ পেয়ে যায় ধর্মব্যবসায়ীরা।

একটি সরকার তাদের মেয়াদকালে দেশের যতোই উন্নতি কোরুক, যতোই ভালো ভালো কাজ কোরুক, তাদেরকে যদি ফতোয়া দিয়ে নাস্তিক বানিয়ে দেওয়া যায় তাহোলে তাদের সব অবদানই ম্লান হয়ে যায়। এমনই একটি অবস্থা বর্তমানে আমাদের সামনে উপস্থিত। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হোয়েছিল সেটা সৃষ্টি করা হোয়েছিল ধর্মকে পুঁজি কোরে। এই মুহূর্তে আমরা যদি যাবতীয় ধরনের ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দেশের ১৬ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ কোরতে না পারি, তাহোলে ধর্মব্যবসায়ীরা আবারও একটি বানোয়াট ইস্যু সৃষ্টি কোরে দেশের পরিস্থিতিকে সঙ্কটাপন্ন কোরে ফেলতে পারে। দেশকে অস্থিতিশীল কোরে ফায়দা লুটার জন্য বৈদেশিক পরাশক্তিগুলিও গোপনে ও প্রকাশ্যে ধর্মব্যবসায়ীদেরকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৬ কোটি চরম ঐক্যহীন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা কি এত সহজ? প্রত্যেকেই একবাক্যে বোলবে যে, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে হাজারো দল ও মতবাদে বিচ্ছিন্ন এই জাতিকে আর ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু জাতির সামনে যে হুমকি আসছে এমতাবস্থায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি মাত্র পথ আছে। এবং সেই পথ আছে আমাদের কাছে। সেই পথ হোচ্ছে, ১৬ কোটি মানুষের সামনে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোস উন্মোচন কোরে দিতে হবে। সেটা কিভাবে?

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে আল্লাহ সত্যদীনের জ্ঞান দান কোরেছেন। তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের স্বরূপ প্রকাশ কোরে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ কোরেছেন যে, ধর্মব্যবসায়ীরা যে এসলাম নিয়ে

ব্যবসা কোরে খাচ্ছে তা আল্লাহর-রসুলের এসলাম নয়। পাশাপাশি প্রকৃত এসলামকে তিনি মানবজাতির সামনে পেশ কোরেছেন। যে এসলাম চরম দরিদ্র, ঐক্যহীন, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ কোরিয়েছিল। তিনি প্রমাণ কোরে দিয়েছেন যে, ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করে, রাজনীতি করে ও জঙ্গিবাদ করে তারা আল্লাহর-রসুলের প্রকৃত এসলামে নেই। এটা এসলাম তো না-ই, উপরন্তু, এটাকে আল্লাহ আগুন খাবার সমতুল্য বোলে ঘোষণা কোরেছেন এবং ধর্মব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ পবিত্রও কোরবেন না, তাদের সঙ্গে কথাও বোলবেন না। আখেরি যুগের আলেমদের আল্লাহর রসুল আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট জীব বোলেছেন। আমরা দুইটি ডকুমেন্টরি ফিল্ম নির্মাণ কোরে পুরো জাতির সামনে এই মহাসত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা কোরছি। ইতোমধ্যেই আমরা প্রায় ২০ হাজার প্রদর্শনী অনুষ্ঠান কোরেছি যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা কোরেছেন। দেশের অধিকাংশ লোক যদি বুঝতে পারে যে, এই ধর্মব্যবসায়ীরা- যারা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা কোরে খাচ্ছে, অপরাজনীতি কোরছে, এদের কাছে থাকা এসলাম আল্লাহর-রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, তাহলে মানুষ আর তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তাদের কথা বিশ্বাস কোরবে না। আমাদের এই কাজে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা কোরছেন। সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা আমাদের অফিস উদ্বোধন কোরছেন, আমাদের সেমিনারগুলোতে এসে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা কোরছেন। তারা আমাদের বোলছেন, সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি আপনাদের সাথে আছে, আপনারা দেশ ও মানবতার কল্যাণে কাজ কোরে যান। কাজেই দেশকে ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা কোরতে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের এগিয়ে আসতে হবে। আসুন, আমাদের মিডিয়া আর যুক্তি-প্রমাণ যা আল্লাহ এমামুয্যামানকে দান কোরেছেন সেটা এবং আপনাদের রাষ্ট্রশক্তি এই তিন বিষয় মিলে আমরা জাতির সামনে প্রমাণ কোরে দেবো যে, ধর্মব্যবসায়ীরা মিথ্যাবাদী। তারা প্রকৃত এসলামে নেই। আমরা এটা প্রমাণ কোরে দেবো যে, তারা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মানুষকে মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে প্রভাবিত করে। আর এটা প্রমাণ কোরতে না পারলে জাতির সামনে সমূহ বিপদ, আমাদের এই দেশটি ধর্মব্যবসায়ীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে, ধর্মের নামে অধর্ম প্রচলিত হবে, মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Theocracy) কায়েম হবে। সেই সুযোগে পরাশক্তিগুলি আমাদের দেশকেও ইরাক বা আফগানিস্তানে পরিণত কোরতে চেষ্টা কোরবে।'

নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান ও রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক ধর্মব্যবসা-জঙ্গিবাদ নির্মূলে অবদান রাখায় সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

আমরা দেশব্যাপী জঙ্গিবাদ ও ধর্মব্যবসা-বিরোধী যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু নেতাকর্মী, শিক্ষক, সমাজসেবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা কোরে যাচ্ছেন। এভাবে যারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৬ কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে সেমিনার আয়োজন কোরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এবং রেলপথ মন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক তাদের হাতে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিয়েছেন। এই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বারবার কালিমালিপ্ত কোরেছে। তারা প্রচার চালায় যে নারী নেতৃত্ব হারাম। আমরা কোর'আন হাদিস ও ইতিহাস থেকে তাদের এই ফতোয়া যে ভুল তা প্রমাণ কোরে দিয়েছি। তারা নানারকম ফতোয়ার বেড়াজালে নারীকে বন্দী কোরে তাদেরকে পশ্চাদপদ, গৃহবন্দী কোরে রাখতে চায়। কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে, প্রকৃত এসলামের সঙ্গে তাদের ফতোয়ার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের সেসব ফতোয়া এসলাম-বহির্ভূত। একটি জাতির অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। সেই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রেখে কোনো জাতি কখনোই উন্নতি কোরতে পারে না। সুতরাং সেই মিথ্যা ফতোয়াগুলির বেড়াজাল ছিঁড়ে নারীকে উন্মুক্ত জগতে বেরিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।

দেশেরপত্রের বিভিন্ন আয়োজনে মন্ত্রীগণ

গত ২৩ মার্চ কুমিল্লায় দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল এম.পি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দৈনিক দেশেরপত্র প্রকাশিত লেখা ও বক্তব্যে এসলামে নারী ও পুরুষের অধিকারের যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছে সমাজের সবাই ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হলে ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের সমুচিত জবাব দেয়া সম্ভব হবে। তারা মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে আমাদের রুখতে পারবে না। এজন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

গত ৫ এপ্রিল গাজীপুরে দৈনিক দেশেরপত্রের ব্যুরো অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম.পি। তিনি বলেন, "আজ দেশেরপত্রের যে আদর্শ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরও সেই একই আদর্শ। দৈনিক দেশেরপত্র যদি তাদের এই লক্ষ্য ও আদর্শে অটল থাকে তাহলে আমরা সর্বাবস্থায় তাদের পাশে থাকবো।"

গত ৯ মার্চ, দৈনিক দেশেরপত্রের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক। তিনি বলেন, 'দেশেরপত্রের এই জঙ্গিবাদ ও ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতির বিষয়বস্তুর সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোটি কোটি সমর্থক একমত এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ জনতা একে সর্বাত্মক সাহায্য করবে।' তিনি এ ব্যাপারে দেশেরপত্রকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দেশেরপত্রের বিভিন্ন আয়োজনে মন্ত্রীগণ

পাবনায় দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা ব্যুরো কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু। তিনি বলেন, "আজকে আমাদের লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে, ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা বিরোধীদের, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে, মানবতা-বিরোধীদের বিরুদ্ধে। দেশেরপত্র সেই চেতনাকে ধারণ করছে বলে আমি দেশেরপত্রের সাথে সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্য পোষণ করছি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান পুরো বাঙালি জাতিকে একত্রিত করার মত এই মহান কাজে দেশেরপত্রই হবে আমাদের মুখপত্র।"

গত ৯ এপ্রিল দৈনিক দেশেরপত্রের খুলনা বিভাগীয় ব্যুরো অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এম.পি।

তিনি জঙ্গিবাদ দমন, ধর্মের নামে অপরাজনীতি এবং ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দেশেরপত্রের চলমান কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে দেশেরপত্রের এই কার্যক্রম প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ ও আপামর জনসাধারণকে এ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গত ১১ এপ্রিল নেত্রকোনায় দেশেরপত্রের জেলা কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। তিনি বলেন- "আপনাদের কথায় আমি পুলকিত হয়েছি, উজ্জীবিত হয়েছি। আমার শিরা-উপশিরা, ধমনীতে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আপনাদের সকল সেন্টিমেন্ট ও বক্তব্যের সাথে আমি একমত। আমাদের পথচলা একসাথে। আজ আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি জাতির মূল সমস্যা কোথায়। এই ধর্মব্যবসায়ী, ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতিকারীরাই জাতির মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আজ, যা আমরা গত ৪৩ বছরেও বুঝতে পারি নি। আমরা সম্মিলিতভাবে এই সমস্যাকে মোকাবেলা করতে চাই।"

একটি প্রশ্নের জবাব ❖ আমেনা আক্তার

মেয়ে হোয়ে কেন পত্রিকা বিক্রি করো?

ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা বাস্তবেই মেয়েদেরকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্য অন্তরীণ কোরে রাখতে চায়, হেযবুত তওহীদের বেলায় এ কথাটি বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হোয়েছে। মোল্লারা যখন ফতোয়া দেয়, তাদের কথাগুলি মানুষ আল্লাহ-রসুলের কথা হিসাবেই বিশ্বাস করে। এটা শিক্ষিত শ্রেণির এক প্রকার অন্ধত্ব। তারা কখনও যাচাই কোরে দেখে না যে ধর্মব্যবসায়ীরা যে ফতোয়া দিচ্ছে সেগুলি রসুলাল্লাহ ও তাঁর আসহাবদের জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। এটা বিবেচনা না কোরেই সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসলাম-বিদ্বেষী কথা চালাচালি আরম্ভ হয় যে, এসলাম মধ্যযুগীয় বিধান, এটি মানুষকে কূপমণ্ডূক বানাতে চায়। আমরাও মোল্লাদের শেখানো কথাগুলিকেই এসলামের কথা হিসাবেই জানতাম। কিন্তু আল্লাহ কি এমন অন্যায় ব্যবস্থা মানুষের উপরে চাপিয়ে দিতে পারেন? যামানার এমামের কাছে জানলাম মূল সত্যটা কী? তিনি আমাদের জানালেন এসলামে নারীদের ভূমিকা কী? আমি হেযবুত তওহীদে যোগ দিয়ে দেখলাম কিভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে থেকেও একত্রে সর্বপ্রকার কাজ কোরে যাচ্ছে। পর্দা প্রথার নামে যে জগদ্দল পাথর মোল্লারা মেয়েদের উপরে চাপিয়ে রেখেছে সেটা যে এসলাম সম্মত নয়, তা আমি বুঝতে পারলাম। প্রকৃত এসলামের হেজাব ও নারী-নীতি চূড়ান্ত প্রাকৃতিক, যা কারও জন্যই মেনে চলা কষ্টদায়ক নয়। আমরা আল্লাহর সত্য এসলামটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সর্বত্র কাজ কোরছি। এই কাজ কোরতে গিয়ে স্বভাবতই আমাদেরকে অনেক অদ্ভুত ও অসংলগ্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়। মোল্লারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা ঘর থেকে বের হোলে কেন? মেয়েদেরকে রাস্তায় বের কোরে দিয়ে হেযবুত তওহীদ তো এসলামটা ধ্বংস কোরে দিচ্ছে।' আমরা তাদেরকে বোলি, 'আপনারা তো ধ্বংসই হোয়ে আছেন। দাজ্জালের হুকুম মেনে আপনাদের ইহজীবন ধ্বংস হোয়েছে, আর মোল্লাদের বিক্রি করা এসলাম মেনে আপনাদের আখেরাত ধ্বংস হোয়েছে। হেযবুত তওহীদ এসেছে আপনাদেরকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কোরতে।'

এ কেমন অন্যায় প্রশ্ন? তাদের এইসব অদ্ভুত ও যুক্তিহীন প্রশ্নের একটাই অর্থ দাঁড়ায়- মেয়েরা ইটভাটায় দিনমজুরের কাজ থেকে শুরু কোরে দেশ পরিচালনা পর্যন্ত সবই কোরতে পারবে, কিন্তু এসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা ঘর থেকেও বের হোতে পারবে না। জাতির এই মানসিক পক্ষাঘাত কবে ঘুঁচবে। ধর্মব্যবসায়ী এই মোল্লা শ্রেণিটি না হয় মানসিক ভারসাম্যহীন, কিন্তু অনেক শিক্ষিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিও কিভাবে কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ সেই বোধ হারিয়ে ফেলেন? তারাও বিকৃত এসলামের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে আইনের ভাষা ফেলে মোল্লাদের ভাষায় কথা বলেন। তাদের এইরকম অসঙ্গত আচরণের মূল কারণ, এসলামের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, এসলামে মেয়েদের কী ভূমিকা ছিলো সেটা জানলেই আমাদের সমাজের মেয়েরা হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হোতে সক্ষম হবে, তাদের চিন্তা চেতনায় প্রবেশ কোরবে প্রকৃত স্বাধীনতার নির্মল আলোকরশ্মি।

মনে রাখা দরকার, অতীতে যখনই সমাজ অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হোয়েছে তখনই একদল মানুষ অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল নিয়ে তথা মুক্তির মশাল নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে উৎসর্গ কোরেছে, তাদের ত্যাগ, তাদের ঘাম, তাদের রক্তের পিচ্ছিল পথ ধরেই এসেছে সত্য, এসেছে সুন্দর, এসেছে শান্তি। যুগেযুগে এই পরিবর্তনের পেছনে কিন্তু শুধু পুরুষ একা অবদান রাখে নি, সকল বিপ্লব ও সমাজের অভূতপূর্ব পরিবর্তনের পেছনে যে একদল মানুষের ভূমিকা ছিলো তার সেই মানুষগুলির প্রায় অর্ধেকই ছিলো নারী। পত্রিকা বিক্রি আমাদের পেশা নয়, এটি আমাদের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সুতরাং মেয়েরা পত্রিকা বিক্রি কোরলে এটিকে ছোট কোরে দেখার কিছু নেই, বরং নারীদের মুক্তির জন্য এটি একটি উদাহরণ।

[যোগাযোগঃ হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৮৫৩৯৯৩২২২, ০১১৯১৩৬৭১১০, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

পরিবারে নারীর ভূমিকা ■ এম. আমিনুল এসলাম

মহিয়সী নারী আম্মা খাদিজা (রাঃ)

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মোসলেম বা অমোসলেম প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই একটি কথা সমভাবে প্রযোজ্য যে, ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত মানুষের জীবন চলার জন্য সনাতন যে পদ্ধতি ছিল তা সকলেই তাদের জীবন থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হারিয়ে ফেলেছেন। যে কারণে আজ জাতির ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রত্যেকটি কাঠামোই মাকড়সার জালের মতো ভঙ্গুর হোয়ে গেছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব কিন্তু সমাজ গঠিত হয় কতগুলো পরিবারের সমন্বয়ে। তাই পরিবারকে বলা যায় রাষ্ট্র নামক সংগঠনের ক্ষুদ্রতম একক। যদি কোন কারণে পরিবারের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় তার প্রভাব সুদূরে প্রসারিত হোয়ে রাষ্ট্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটি পরিবারকে সুখী, শান্তিময়, উদারহণযোগ্য কোরে গড়ে তোলার জন্য নারীর অবদান অপরিসীম। পরিবার জীবনে নারীর এই সুদূরপ্রসারী গৌরবান্বিত ভূমিকা একটি মহিয়ান জাতির ভিত্তিস্বরূপ। দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যে সূত্র উপস্থাপন কোরেছেন সেখানেও আছে একই কথা-- আমাকে একজন আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব।

আল্লাহর সৃষ্টি পরিচালনার একটি অনন্য নিদর্শন এই পরিবারে নারীর ভূমিকা। যাঁকে আল্লাহ সমস্ত মানব জাতির উত্তম আদর্শ হিসাবে সৃষ্টি কোরেছেন সেই মহামানবকেও উৎসাহ উদ্দীপনা অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন একজন নারী। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে একজন নারীর বিশ্বসভ্যতার গোড়া পত্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করার ইতিহাস বিস্ময়কর। দুঃখের বিষয় হোল সেই মহিয়সী নারীর জীবনের অধিকাংশ অধ্যায়ই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু আলো দীপ্যমান আছে তা দিয়েই যদি এই মোসলেম দাবিদার নারী নিজেদের জীবনকে আলোকময় করে, তবে তা এ জাতির নব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রাখবে।

আম্মা খাদিজা (রাঃ) মক্কা নগরীর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তার সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য আরবের এই জাহেলি সমাজে তিনি তাহেরা অর্থাৎ পবিত্রা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, আত্মমর্যাদাবোধ, দূরদৃষ্টি, সাহস ইত্যাদি বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। যে কারণে তিনি সুদূর বিদেশেও ব্যবসা পরিচালনা কোরতে সক্ষম ছিলেন। আল্লাহ তাঁর খ্যাতিকে আরও বাড়িয়ে দেন রসুলাল্লাহর সহধর্মিনী হিসাবে নিযুক্ত কোরে।

খাদিজার (রাঃ) পিতার নাম ছিল খুওয়াইলিদ এবং মাতার নাম ছিল ফাতেমা। পিতার দিক থেকেই তার বংশের ধারা রসুলের বংশের ধারার সাথে মিলিত হোয়েছে। বংশীয় গৌরব ও আভিজাত্যের ধারায় তিনি ছিলেন গৌরবদীপ্ত। তার ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কা নগরীর সর্বস্তরের মানুষ এতটাই মুগ্ধ ছিল যে, অনেক অভিজাত কোরাইশ যুবকই তাকে সহধর্মিনী হিসাবে পাওয়ার জন্য অন্তরে অভিলাষ পোষণ কোরত।

রসুলাল্লাহর সাথে বিয়ের আগেও এই মহিয়সী নারীর আরও দুটি বিয়ে হোয়েছিল। জাহেলী যুগেই তাদের মৃত্যু হয়। বালক বয়স থেকেই রসুলাল্লাহ চাচা আবু তালেবের সঙ্গে মক্কা থেকে সিরিয়ায় ব্যবসায়িক কাজে যাতায়াত করেন, এই সূত্রে তাঁরও বেশ ব্যবসায়ীক অভিজ্ঞতা হোয়েছিল, তাছাড়াও সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতার জন্য তিনি মক্কাবাসীদের দ্বারা আল-আমীন, আস্-সাদীক উপাধিতে ভূষিত হোয়েছিলেন। রসুলাল্লাহকে নিজ ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ রাখা ও তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেন খাদিজা (রাঃ)। রসুলাল্লাহর চারিত্রিক মাধুর্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি মুগ্ধ হোয়ে অন্যান্য সকল প্রস্তাবকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজে রসুলাল্লাহকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে উভয় পরিবারের সম্মতিতেই সকল আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে অত্যন্ত ঘটা কোরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা দেনমোহরের বিনিময়ে তাঁদের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। তখন রসুলাল্লাহর বয়স ছিল ২৫ বছর পক্ষান্তরে খাদিজা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

বিয়ের পরেই তিনি তার সকল সম্পদ এবং ব্যবসায়িক দায় দায়িত্ব রসুলাল্লাহর উপর ন্যস্ত কোরে দেন। নবুয়্যত পাওয়ার পূর্বে বেশ কয়েকবছর রসুল মক্কার হেরা পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কৈশোর থেকেই তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ কোরলে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সমাজের এই কলুষতাকে, ধর্মের নামে অধর্ম, দীনে হানিফকে মূর্তিপূজায় আচ্ছন্নকরণ, পাপ পঙ্কিলতাকে, অন্যায় অত্যাচারকে, খুন রাহাজানি দাঙ্গা হাঙ্গামায় জর্জরিত এই অশান্তিময় মানবজীবনকে তিনি অপছন্দ কোরতেন এবং এর পরিবর্তন সাধন কোরে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় এটাই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়বস্তু। এ সময়টিতে সংসারের কাজে কর্মে তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না। সাধারণ বিচারে যখন কোন পুরুষ সংসারে অমনোযোগী হোয়ে পড়েন তখন তার স্ত্রীর প্রধান চেষ্টাই থাকে স্বামীর মনকে যে কোন উপায়ে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হোল, রসুলাল্লাহর এই সংসার-বিচ্ছিন্নতা এবং ধ্যানের কাজে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে আম্মা খাদিজা (রাঃ) সর্বাত্মক সহযোগিতা কোরে যেতেন। ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই যে, রসুলাল্লাহ তার ব্যবসায়ীক কাজকর্ম ও প্রাত্যহিক সকল কাজকে তুচ্ছজ্ঞান কোরে হেরাগুহায় নির্জনে সময় কাটাচ্ছেন কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী

যিনি এই ব্যবসার গোড়া পত্তন কোরেছেন তিনি একটি বারের জন্যও রসুলের এই কাজের বিরোধিতা কোরেছেন বা এজন্য তাঁদের পরিবারে কোন অশান্তি সৃষ্টি হোয়েছে। বরং গুহায় যাত্রাকালে রসুল যে খাদ্যদ্রব্য সাথে নিয়েছেন তা শেষ হওয়ার আগেই আরও খাদ্য প্রস্তুত কোরে নিজে তা বহন কোরে আম্মা খাদিজা (রাঃ) গুহায় নিয়ে যেতেন। হেরা পাহাড়টি মক্কা থেকে সোয়া তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সমতল থেকে গুহাটির উচ্চতা ২৭০ মিটার। বর্তমান সময়কালে হাজীদের পর্যটনের সুবিধার পথ তৈরি করা হোয়েছে, কিন্তু ১৪০০ বছর আগে সেটা ছিল অতি দুর্গম এবং বিপজ্জনক আর আম্মা খাদিজা (রাঃ) তখন ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কা। অথচ আজকের এই নিরাপদ ভ্রমণের যুগেও অধিকাংশ হাজীই কেবল পরিশ্রমের ভয়ে হেরাগুহা দেখতে যান না। বিয়ের ১৫ বছর পর প্রথম যেদিন হেরা গুহায় জিব্রাইল আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাসত্যের বাণী নিয়ে রসুলের কাছে আসলেন, সেদিন রসুলাল্লাহ অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হতবিহ্বল হোয়ে বাড়ি ফিরে এসেই আম্মা খাদিজাকে বোললেন, "আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।" অতঃপর তিনি আম্মা খাদিজার নিকট ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন এবং নিজের জীবনের আশংকা ব্যক্ত কোরলেন। কিন্তু খাদিজা (রাঃ) যেন আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ও প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বোললেন যে, 'না, কখনই এ হোতে পারে না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত কোরবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ, মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।' অন্য বর্ণনা মোতাবেক খাদিজা বোললেন যে, 'হে আবুল কাসেম! আপনি শুভসংবাদগ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে খাদিজার প্রাণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি এ উম্মতের নবী।'

একজন মানুষের উপরে নবুয়্যতের দায়িত্ব আসা একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। স্বামীর ক্ষেত্রে এমন সাংঘাতিক ঘটনায় যে কোন নারীই আশ্চার্যান্বিত হবেন, চিন্তাযুক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। অথচ নারীর স্বাভাবিক প্রকৃতির বাইরে গিয়ে কোন ধরনের হতাশায় আবেগে আক্রান্ত না হোয়ে প্রথম শ্রবণেই এমন অনুপ্রেরণা দেয়া, সাহস যোগানো, ভীতি দূর করার মত ধীরতাসম্পন্ন নারী ইতিহাসে বিরল। যেখানে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব ভীত ও বিচলিত সেখানে তাঁকে প্রথম কথাতেই অভয় দেয়া, নিশ্চিন্ত কোরে দেয়া, একজন সাধারণ নারীর দ্বারা এ অসম্ভব। তাই আম্মা খাদিজা (রাঃ) কোন সাধারণ নারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন রসুলাল্লাহর যোগ্য সহধর্মিনী হিসাবে আল্লাহর সৃষ্ট এক মহামানবী। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবীয় নারীর পক্ষে নির্জন পাহাড়ের গুহায় ভূত পেত্নী, জিন-পরী ইত্যাদির দ্বারা স্বামীর কোন অনিষ্ট ঘটার আশঙ্কাই সাধারণ ছিল কিনা? এখানেই শেষ নয়, রসুলকে আরও আশ্বস্ত কোরতে তাঁর নিজ চাচাত ভাই, জ্ঞানী ও সুফি সাধক ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকাও সাক্ষ্য দেন যে মহানবী আল্লাহর মনোনীত রসুল, তাঁর কাছে যিনি আগমন কোরেছেন সেই একই পবিত্র আত্মা (রুহুলকুদ্দুস) জিব্রাইল পূর্বের নবীদের নিকটও এসেছিলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুলের উপর যে ওহী আসতো তা সত্য বোলে মেনে নিলেন এবং তাঁর কাজে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান কোরতে থাকলেন। তার ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীর কাজকে কিছুটা সহজ কোরে দেন। কেননা যখনই কেউ তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান কোরত বা তাঁকে মিথ্যুক বোলত, তিনি মর্মাহত হোতেন, উৎসাহহীন হোয়ে পড়তেন। কিন্তু যেই তিনি বাড়িতে ফিরতেন তখন আম্মা খাদিজা (রাঃ) সুমধুর সান্ত্বনাবাণী, সত্যের সাক্ষ্যপ্রদান, সাহস প্রদান ও প্রবোধবাক্যে তাঁর মনের ক্ষোভ দূর কোরে দিতেন। ফলে রসুলাল্লাহ আবারও মানুষের কাছে সত্যের আহ্বান জানাতে আত্মিক শক্তি ও প্রেরণা ফিরে পেতেন, কোন কষ্টদায়ক কথাই আর তাঁর হৃদয়ে রেখাপাত কোরতে পারতো না। পরকালে আম্মা খাদিজার (রাঃ) সুখময় জীবনের সুসংবাদ দিতে গিয়ে রসুলাল্লাহ বোলেছেন, "আমি খাদিজার জন্য এমন একটি গৃহের সুসংবাদ দিতে আদিষ্ট হোয়েছি, যা কাসাব বা ফাঁপা মুক্তা দিয়ে তৈরি এবং যা সর্বপ্রকারের অসার কথা, চিৎকার ও অপ্রীতিকর বস্তু থেকে মুক্ত।" সালাহ ফরদ হয় নি, তখনও তিনি রসুলের সাথে ঘরের মধ্যে সালাহ কায়েম কোরতেন। একদিন আলী (রাঃ) দেখতে পান যে, তারা দুজন সালাহ কায়েম কোরছেন। এ সময় জিজ্ঞেস কোরলেন, এটা কি? রসুল তখন দীনের দাওয়াত পেশ কোরলে আলী তা গ্রহণ কোরে নেন। সেই থেকে তারা তিনজন একত্রে সালাহ কায়েম কোরতেন। এসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হোয়েছিল ৫৫ বছর। এসলাম গ্রহণের পর খাদিজা তার সমস্ত সম্পদ দীনের বালাগের জন্য কোরবানি কোরে দেন। রসুলাল্লাহ পরিপূর্ণভাবে এসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হোয়ে যায়। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আর্থিক সঙ্কটসহ সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলার দায়িত্ব, এক কথায় পরিবারের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। নবুয়্যতের সপ্তম বছর মহররম মাসে কোরায়েশরা মো'মেনদেরকে বয়কট করে। মো'মেন নারী, শিশু, পুরুষ, বৃদ্ধ সকলে শিয়াবে আবু-তালিব নামক উন্মুক্ত গিরিসঙ্কটে গিয়ে বাস কোরতে শুরু করেন। রসুলাল্লাহর সাথে আম্মা খাদিজাও (রাঃ) সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিন বছরকাল তাঁরা সেখানে দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করেন। মরুভূমিতে গাছও দুশ্প্রাপ্য। মরুভূমির কন্টকাকীর্ণ গাছের পাতা, গাছের মূল খেয়েই তাদের তিন বছর জীবন ধারণ কোরতে হোয়েছে। মরুর উত্তপ্ত বালির উপর, অগ্নিকুণ্ডসম সূর্যের প্রখর রৌদ্রের খরতাপ সহ্য কোরেও আম্মা খাদিজা স্বামীর সঙ্গে তিন বছর বন্দিজীবন কাটালেন। এমন দুর্দিনেও খাদিজা (রাঃ) নিজের পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা মো'মেনদের খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা কোরতেন। তার তিন ভাতিজা হাকীম ইবনে হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুময়া ইবনুল আসওয়াদ গোপনে গোপনে সেই খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিয়ে যেত, কিন্তু যখন সেটা জানাজানি হোল মক্কার মোশরেকরা কঠিন পাহারা আরোপ কোরে সে পথও রুদ্ধ কোরে দিল। রসুলের সাথে ২৫ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পরে নবুয়্যতের দশম বছরে দশই রমাদান পয়ষট্টি বছর বয়সে এই মহীয়সী নারী পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। মুরাদ হফম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বলেন, আম্মা খাদিজা (রাঃ) শিয়াবে আবু তালেবে বন্দি থাকাকালীন তিনি খাদ্যাভাবের কারণে চরম পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত হন। এই অসুস্থতা থেকে তিনি আর পূর্ণ সুস্থ হন নি। তখনও জানাজার বিধান প্রচলিত হয় নি তাই জানাজা

ছাড়াই তাকে মক্কার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লাহয় দাফন করা হয়। রসুল নিজেই তার পবিত্র দেহ কবরে নামান।

খাদিজা (রা:) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। তিনি ছিলেন রসুলাল্লাহর ৬ সন্তানের জননী। প্রথম সন্তান কাসিম, অল্পবয়সে মক্কা শরীফে এন্তেকাল করেন। ২য় সন্তান জয়নাব, ৩য় সন্তান আবদাল্লাহ, তিনি নবুয়্যত প্রাপ্তির পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও অল্প বয়সে এন্তেকাল করেন। চতুর্থ সন্তান রোকাইয়া (রা:), পঞ্চম সন্তান উম্মে কুলসুম (রা:), ষষ্ঠ সন্তান ফাতেমা (রা:)। উকবার দাসী সালামাকে মজুরির বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। এবরাহিম ছাড়া রসুলাল্লাহর অন্য সব সন্তানই খাদিজার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় নবী করিম (দ:)আর কোন বিয়ে করেন নি। সেই জাহেলী যুগেও তিনি ছিলেন পূতঃপবিত্র। কখনো মূর্তি পূজা করেন নি। একদিন নবী তাকে বোললেন, 'আমি লাত-উয্যার এবাদত কোরবো না। খাদিজা (রা:) বোললেন, লাত-উয্যার কথা ছেড়ে দিন, তাদের প্রসঙ্গই উত্থাপন কোরবেন না।

আম্মা খাদিজা (রা:) এসলামের বিজয় দেখে আসেন নি, বিজয়ের কোন পূর্বাভাসও তিনি দেখতে পান নি। তিনি যতদিন রসুলাল্লাহর সঙ্গী হোয়ে ছিলেন ততদিন ছিল এসলামের চরমতম দুর্দিন। সেই দুর্দিনেও তিনি নিজের জীবন ও সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় কোরে দিয়ে নবসূচিত বিপ্লবের শক্তি যুগিয়ে গেছেন। নবুয়্যতি সংগ্রামের সূচনালগ্নে তিনিই ছিলেন রসুলাল্লাহর একমাত্র পরামর্শদাত্রী। একাধারে বয়োজ্যেষ্ঠা, বিদুষী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও প্রখ্যাত ধনবতী নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামীর সেবা কোরতেন। একবার তিনি একটি পাত্রের কোরে রসুলাল্লাহর জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল এসে রসুলাল্লাহকে বোললেন, 'আপনি তাঁকে আল্লাহর ও আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দেন।' আল্লাহ নিজে আম্মা খাদিজার (রা:) প্রতি জিব্রাইল মারফত সালাম পাঠিয়েছিলেন। রসুলাল্লাহ যখন সেই সালাম পৌঁছান তিনি জবাবে বোললেন, "আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ আমাকে সালাম দিয়েছেন; আমার জীবন সার্থক, কিন্তু আল্লাহর সালামের উত্তর কিভাবে দিতে হয় তা তো আমি জানি না। যেভাবে দিলে ভাল হয় আপনি সেইভাবে আমার পক্ষ থেকে উত্তর পৌঁছে দিন।" (বোখারী)

রসুলাল্লাহ (দ:) প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার স্মৃতি সারাজীবনেও ভোলেন নি। বাড়িতে যখনই পশু জবেহ হোত তিনি তালাশ কোরে কোরে আম্মা খাদিজার (রা:) বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোশত পৌঁছিয়ে দিতেন। আম্মা খাদিজার (রা:) ওফাতের অনেক পরে একদিন তাঁর বোন হালা মদিনায় রসুলের সাথে সাক্ষাৎ কোরতে আসলেন। রসুলাল্লাহ তার কণ্ঠস্বর শুনেই বোললেন, 'হালা এসেছো?' তখন তাঁর মানসপটে খাদিজার স্মৃতি ভেসে উঠলো, তিনি তখন অনেকক্ষণ আম্মা খাদিজার (রা:) স্মৃতিচারণ করেন। আয়েশা (রা:) বলেন, যদিও আমি খাদিজাকে দেখি নি তবুও তার প্রতি আমার এত ঈর্ষা হোত যে অন্য কারো বেলায় এমনটা হোত না। কারণ, প্রায়ই রসুলাল্লাহ তাঁর কথা স্মরণ কোরতেন।' নারীসুলভ ঈর্ষাপরবশ হোয়ে মাঝে মাঝে আয়েশা (রা:) আম্মা খাদিজার (রা:) প্রতি কটাক্ষবাক্য ব্যবহার কোরলে রসুলাল্লাহ খুবই অসন্তুষ্ট হোতেন এবং বোলতেন যে, 'আল্লাহ আমার অন্তরে খাদিজার ভালোবাসা সৃষ্টি কোরে দিয়েছেন।'

খাদিজার মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হোয়েছে। একটি বর্ণনায় রসুলাল্লাহ বলেন, 'মরিয়ম বিনতে এমরান ছিলেন তাঁর যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী, আর খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা:) ছিলেন তাঁর যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী" (তিরমিজী)। আম্মা খাদিজার এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি তা রসুলাল্লাহই বোলে গেছেন। আয়েশা (রা:) একবার বোলেছিলেন, 'আপনি এখনও একজন বৃদ্ধার কথা মনে কোরছেন যিনি বহু আগেই মারা গেছেন। আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান কোরছেন।' জবাবে রসুলাল্লাহ বোললেন, 'কখনো না, মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা বোলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সে তখন আমাকে সত্য বোলে মেনে নিয়েছে। সবাই যখন কাফের ছিল সে তখন মোসলেম ছিল। কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে নি, সে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এবং তার গর্ভেই আমার সন্তান হোয়েছে।"

ঘুমিয়ে কেন এ দুঃসময়ে?

ডা. শাহীন মাহমুদ

ঘুমিয়ে কেন এ দুঃসময়ে? জাগ্রত মহাগতি।
হে নারী, জাগো, জাগাও এ জাতি, কাটাও এ দুর্গতি।

কুপমণ্ডুক সন্তান মোরা অন্ধ অহংকারে
তোমার স্বরূপ দেখিনি মোদের মিথ্যে সংস্কারে।
শক্তি হোয়েছো গৃহবন্দী,
ভোগ্যপণ্য, দৃষ্টিনন্দী,
যে হাত বিলায় আলো আর প্রেম যুগে যুগে দ্বারে দ্বারে,
তার আলো কেন ডুবে আছে আজো, ক্ষীণ দৃষ্টির ভারে?

এখনো কি তবে হয় নি সময় চোখ মেলে তাকাবার
জন্মদাত্রী বন্ধ্যা হোলে তো মৃত্যু এ জাতিটার।
তোমার শিক্ষা, সভ্যতা, নীতি, তোমার শিষ্টাচার
তোমার সাহস না পেলে মোদের শক্তি কোথায় আর?

চেয়ে দেখো এই জীর্ণ জাতির ভাগ্য অস্তাচলে
শক্তিবিহীন নির্জীব প্রায় তোমায় চেনে নি বোলে
উঠে এসো, নাও নিজের আসন
ঊষর মরুতে জাগাও জীবন
নতুন সূর্য নিয়ে এসো এই রাত্রির আঁচলে।
দুঃসময়ের রাত কেটে যাবে তুমি জাগ্রত হোলে।

মনুসংহিতায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা

রিয়াদুল হাসান

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে বেদ ও গীতার পরই মনুসংহিতার স্থান নির্দেশ করা হয়। ভারতীয় ঋষিদের বিশ্বাস- মনুসংহিতায় সমস্ত বেদের অর্থ নিহিত রোয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দণ্ডবিধি প্রভৃতির বিচিত্র আধার এই গ্রন্থটি। এ ধরণের ধর্মশাস্ত্র সাধারণত 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামে অভিহিত এবং এই স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতাদের মধ্যে মনুই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হোয়ে আসছেন। মনুর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে আমরা অন্য প্রবন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ কোরেছি, আজকের প্রসঙ্গ ভিন্ন। কেবল একটি মূল সত্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে, ইতিহাসে ১৪ জন মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরমধ্যে বৈবস্বত মনু হচ্ছেন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসহ কোর'আনে বর্ণিত নুহ (আ:)। একটি মহাপ্লাবনে মানবজাতি ধ্বংস হোয়ে আবার মনু (আ:) থেকে শুরু হোয়েছিল, তাই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে মনুকে মানবজাতির আদিপিতা বোলে অভিহিত করা হয়। ঋগ্বেদে এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে মনুকে মনুষ্যজাতির জনক আদিপিতা, পুরাতন ঋষি, অগ্নিদেবের সংস্থাপক, অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা, কৃতযুগের রাজা প্রভৃতিরূপে উল্লেখ করা হোয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি বোলছেন- "প্রজাপতি (ব্রহ্মা) মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মনুই প্রজাদের মধ্যে তা প্রচার করেন।" তাঁর উপরই আল্লাহ সর্বপ্রথম ধর্মগ্রন্থ নাযেল করেন যার নাম বেদ। বেদের ধারক এবং মনুর অনুসারীরাই বর্তমানে হিন্দু বা সনাতন ধর্মী হিসাবে পরিচিত।

অনেকে অভিযোগ করেন, মনুসংহিতা একটি নারীবিরোধী গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পণ্ডিত ও বিদ্বান সমাজ একথা বহুবার স্বীকার কোরেছেন যে, সনাতন ধর্মশাস্ত্রের একটি গ্রন্থও তার সঠিক অবস্থানে নেই। মনুসংহিতাতেও বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে। অনেক সময় স্বার্থান্বেষী পুরোহিতরা নিজেদের পক্ষে ধর্মকে টানার জন্য ঐশী গ্রন্থে বা ঐশী শিক্ষামূলক গ্রন্থে নিজেদের মনগড়া কথাকে ঈশ্বরের বাণী বলে ঢুকিয়ে দেয়। শ্লোক রচনার গঠন রীতির আধুনিকতা ও প্রাচীনতা বিবেচনা কোরে এই জাল শ্লোকগুলো আলাদা করা খুব কঠিন কিছু নয়। এই জাতীয় অপকর্মে কোনো ধর্মের পুরোহিতরাই পিছিয়ে নেই। এসলাম ধর্মের পুরোহিতরা কোর'আনে কিছু পরিবর্তন কোরতে পারেন নি, কারণ এই মহাগ্রন্থ শেষ ঐশীগ্রন্থ। তাই আল্লাহ নিজে এর সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন (সুরা হিজর ৯)। কিন্তু হাদীস বা ইতিহাস, মাসলা মাসায়েল বা ফেকাহ শাস্ত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নেন নি। সেখানে এই পুরোহিত আলেম ওলামা, মাজহাবের এমাম সাহেবরা তাদের ক্ষুরধার মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং দীনের মধ্যে নিজের মনগড়া হাজারো মতবাদ, জাল হাদীস, ইজমা, কেয়াস, ফতোয়া প্রবেশ কোরিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন ধর্মগুলির সকল গ্রন্থই এভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। তবুও সেগুলির মধ্যে যে শিক্ষা এখনো সঞ্চিত আছে তা বিচার কোরলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রায় সকল ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন ডালে উৎপন্ন একই গাছের ফল।

কেবল যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করা হোয়েছে তা বলা ভুল হয়। অনেক মুনি ঋষি পণ্ডিত মানবতার কল্যাণেও অনেক নীতিবাক্য শাস্ত্রের অঙ্গীভূত কোরে দিয়েছেন। তারা নিজের নাম, যশ, খ্যাতি চান নি, বরং অন্যের লেখার মধ্যে নিজের শ্রমসাধ্য রচনাগুলিকে প্রবেশ করিয়ে অমরত্বের আনন্দ লাভ কোরতে চেয়েছেন। এভাবে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্য দিনে দিনে বৃহদায়তন হোয়ে উঠেছে। আদি মনুসংহিতা শাস্ত্রটি অধ্যয়ন কোরলে যে কেউ বুঝতে সক্ষম হবেন যে, পৃথিবীতে নারীকে মর্যাদা দানে মহর্ষি মনুর প্রচারিত শিক্ষা এতো চমৎকার যে কেবলমাত্র সত্যধর্মেই এমন বিধান থাকা সম্ভব। এমনকি মনুসংহিতার ভাবধারার সাথে খাপ খাওয়াতে হোতে হলে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক নারীবাদীদের চিন্তাধারারও উন্নয়নের প্রয়োজন। আমরা এখন এমন একটি শ্লোক পড়ব যার অর্থ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে নারীরাই হচ্ছে কোন উন্নত সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। এটি নারীদের প্রতি কোন চাটুকারিতা বা তোষামদি নয়। এটি এমন একটি সত্য যা নারীবিদ্বেষীদের কাছে বিষের মতো, আর নারীশক্তির মহিমা কীর্তনীয়াদের কাছে অমৃতস্বরূপ। প্রকৃতির এই নিয়ম পরিবার, সমাজ, ধর্মগোষ্ঠী, জাতি বা সমগ্র মানবতার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যারা হিন্দুধর্মকে নারী-পীড়ক বলে দোষারোপ করেন, তারা কখনোই এই শ্লোকের উদ্ধৃতি দেন না। এই শ্লোকগুলি মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে (ধর্মসংস্কার প্রকরণ) উল্লেখিত হোয়েছে। আমি কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ দিচ্ছি।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণকামীপ্সুভিঃ॥ (৩/৫৫)
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ (৩/৫৬)
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা॥ (৩/৫৭)

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃঃ (৩/৫৮)
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছদাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ॥ (৩/৫৯)

অনুবাদ:

১. বিবাহের সময় বরই কেবল কন্যাকে ধন দেবেন এমন নয়। বিবাহোত্তরকালেও বরের পিতা, ভাই, পতি বা দেবর সকলেই যদি অতুল কল্যাণরাশির অভিলাষী হয় তাহলে ঐ কন্যাদের মৃদুবাক্য, ভদ্র ব্যবহার, ভোজনাদি ও উপহারাদি দ্বারা সর্বদা খুশি ও সন্তুষ্ট রাখবেন এবং বস্ত্র-অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত কোরবেন।

২. যে বংশে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা সমাদৃত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে বংশে স্ত্রীলোকদের সমাদর নেই সেখানে সমস্ত ক্রিয়া (প্রার্থনা, উপাসনাদি) নিষ্ফল।

৩. যে বংশে ভগিনী ও গৃহস্থের স্ত্রী (নারীকূল) পুরুষদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখিনী হয়, সেই বংশ অতি শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৪. আর যে বংশে স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট থাকে, সেই বংশ নিশ্চিতভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আর যে বংশকে উদ্দেশ্য করে ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অনাদৃত, অপমানিত হোয়ে অভিশাপ দেন, সেই বংশ বিষপান করা ব্যক্তি ন্যায় ধন-পশু প্রভৃতিসহ সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৫. অতএব যারা ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা (পতিসম্বন্ধীয় লোকেরা) বিভিন্ন সৎকার্যের অনুষ্ঠানে এবং নানা উৎসবে উত্তম অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজনাদি দ্বারা স্ত্রীলোকদের সম্মান প্রদর্শন (পূজা) করে প্রীত রাখবে।

সুতরাং পরিবারের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য নারীকে সর্বদা সুখী রাখতে হবে - এটাই মহর্ষি মনুর নির্দেশ। পাশাপাশি তিনি স্বামীর মনোরঞ্জন ও প্রীতিলাভের জন্য স্ত্রীলোকদেরকে শোভাজনক বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা সুসজ্জিত ও দীপ্তিমতী হোয়ে থাকার জন্য উপদেশ দিয়ে বোলেছেন:

স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাস্ত্বরোচমানায়াং সর্বমেব ন রোচতে। (৩/৬২)

অনুবাদ: ভূষণাদির দ্বারা স্ত্রী সুসজ্জিত থাকলে সমস্ত পরিবার (কুল) শোভামণ্ডিত থাকে। আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি রুচি না থাকে তাহলে সমস্ত পরিবার শোভাহীন হোয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা মহর্ষী মনুর লিপিবদ্ধ বাণী মনুস্মৃতিকে নারী বিদ্বেষী গ্রন্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। 'মনু' শব্দ থেকেই মানুষ, মনুষ্যত্ব, মানবতা শব্দের উৎপত্তি। তাই মহর্ষী মনুর বাণীগুলি কেবল নারী বা পুরুষ নয়, মানবতার জয় প্রচার করে। মানবসমাজের প্রাণ হচ্ছে নারী সমাজ। তাদের মাধ্যমেই মানব প্রজাতির বংশধারা, প্রজন্ম রক্ষিত হয়। এজন্য তাদের বিশেষ সম্মান প্রাপ্য। তিনি বলেন:

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন (৯/২৬)

অর্থাৎ, স্ত্রী লোকেরা সন্তানাদি প্রসব ও পালন করে বলে তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। তারা গৃহের দীপ্তি বা প্রকাশস্বরূপ। এই কারণে স্ত্রীলোকদের সকল সময়ে সম্মান-সহকারে রাখা উচিৎ। বাড়ীতে স্ত্রী আর শ্রী এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

আজও ভারতবর্ষে মহর্ষি মনুর এই শ্লোক থেকেই শিক্ষা নিয়ে মেয়েদের ভাগ্যশ্রী বা গৃহলক্ষ্মী বলা হয়। এর একটি কারণ হিসাবে টিকাকার মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন স্ত্রীলোক বাড়িতে না থাকলে কুটুম্ব বা আত্মীয়বর্গের আদর-আপ্যায়ন কিছুই হয় না। পুরুষের ধনৈশ্বর্য থাকলেও যদি ভার্যা না থাকে, তাহলে বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা উপস্থিত হলে গৃহস্বামী নিজে তাদের প্রত্যেককে পান-ভোজনাদির দ্বারা আপ্যায়িত করতে পারেন না। অন্যকথায়, মাতৃরূপে, কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, ভগ্নীরূপে কিংবা ধর্মকর্মে অংশীদাররূপে নারীরাই সকল কল্যাণের মূল উৎস বলে মহর্ষি মনু প্রতিপাদন কোরেছেন।

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥
(৯/১০১)

অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠকর্তব্য সম্বন্ধে এই কথাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, মরণকাল পর্যন্ত ভার্যা ও পতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যায় আচরণ কোরবে না।

এখানে কোন বিশেষ অর্থ না দেখিয়ে সাধারণভাবে 'অব্যভিচার' বলা হোয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা সকল কাজে অব্যভিচার কোরতে বলা হোয়েছে অর্থাৎ কোনো কাজই উভয়ের একজন আর একজনকে ছেড়ে কোরতে পারবে না। এইজন্য আপস্তম্ব বোলেছেন, 'ধর্ম, অর্থ এবং কাম কোনো কাজেই পত্নীকে লঙ্ঘন করা অর্থাৎ তাকে বাদ দেওয়া যাবে না।' ধর্ম, অর্থ, কাম এগুলি শ্রেয়ঃ, এই তিনটিকে বলা হয় ত্রিবর্গ। নারী ও পুরুষ একে ভিন্ন অপরে অসম্পূর্ণ। এজন্য বেদে (শ্রুতি) বলা হোয়েছে ধর্মকর্ম পত্নীর সাথে মিলিতভাবে কর্তব্য। (মনুসংহিতা ৯/৯৬)

বৈদিক ধর্মের এই শিক্ষা থেকেই নারীকে বলা হয় পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিনী। এই শ্লোকটির কথা একবার ভেবে দেখুন। নারী ছাড়া পুরুষ অসম্পূর্ণ একথা এসলাম ধর্মেও বলা হোয়েছে। তাই নারী ছাড়া পুরুষের দীন বা ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। তাই আল্লাহ বিধান হচ্ছে গৃহে এবং মসজিদে নারী ও পুরুষ উভয়ে একই সঙ্গে সালাহ কায়েম কোরবে, একই সঙ্গে হজ্ব কোরবে, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একই সঙ্গে অংশ নেবে। এবার নারীদের স্বাতন্ত্রের কথায় আসা যাক। স্মর্তব্য, স্বাধীনতা মানে উশৃঙ্খলা নয়, স্বাতন্ত্র্য মানেই ঔদ্ধত্য নয়।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মনমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ। (৯/১২)

অর্থাৎ যে স্ত্রী দুঃশীলতা হেতু নিজে আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাকে পুরুষগণ ঘরে আটকে রাখলেও সে অরক্ষিতা (Are not well

guarded) থাকে। কিন্তু যারা সর্বদা আপনা-আপনি আত্মরক্ষায় তৎপর, তাদের কেউ রক্ষা না কোরলেও তারা সুরক্ষিতা হোয়ে থাকে।

সুতরাং স্ত্রীলোকদের গৃহবন্দী করে রাখা ধর্মের উদ্দেশ্য নয় এবং সতীত্ব রক্ষার্থে সেটা অকার্যকর উদ্যোগ। স্ত্রীজাতির নিরাপত্তা প্রধানত তাদের নিজস্ব মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। কিভাবে নারীর চরিত্র দূষিত হয় এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বলা হোয়েছে পরবর্তী শ্লোকে।

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্।
স্বপ্নোহন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্॥ (৯/১৩)

অর্থাৎ মদ্যপান, দুষ্ট লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো, অসময়ে ঘুমানো এবং আত্মীয় কুটুম্বের বাড়িতে দীর্ঘদিন বাস করা এই ছয়টি বিষয় স্ত্রীলোককে দূষিত করে।

নারীদের প্রতি সামাজিক শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শনের রীতিও মনুসংহিতায় উল্লেখ করা হোয়েছে। যেমন:

১. নববিবাহিতা বধূ, কন্যা এবং গর্ভবতী মহিলাদের অতিথি ভোজনের পূর্বেই ভোজন প্রদান করতে হবে। (৩/১১৪)

২. বাহনে বা যানে আরোহী ব্যক্তির পক্ষে বয়স্ক ব্যক্তি, ক্লান্ত ব্যক্তি, ভারবাহী ব্যক্তি, বর, রাজা, স্নাতক এবং স্ত্রীলোকদের পথ ছেড়ে দেয়া কর্তব্য।" (মনুসংহিতা ২/১৩৮)

নারী নির্যাতনের দণ্ডবিধান:

১. নারী অপহরণকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। (৮/৩২৩)।

২. যারা নারী, শিশু ও গুণবান পণ্ডিতদের হত্যা করে, তাদের কঠিনতম শাস্তি দিতে হবে।" (৯/২৩২)

৩. যারা অন্যের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে বা কোরতে প্রবৃত্ত হয় বা তাদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করে তাদের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে তা অন্যদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং কেউ তা কোরতে আর সাহস না পায়।" (৮/৩৫২)

৪. যদি কেউ মা, স্ত্রী বা কন্যার নামে মিথ্যা দোষারোপ করে তবে তাকে শাস্তি দিতে হবে।" (৮/২৭৫)

৩. যদি কেউ কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া মা, বাবা, স্ত্রী বা সন্তান ত্যাগ করে, তাকে কঠিন দণ্ড দিতে হবে। (৮/৩৮৯)।

৪. যদি কোন নারীকে সুরক্ষা দেবার জন্য পুত্র বা কোন পুরুষ পরিবারে না থাকে, অথবা যদি সে বিধবা হোয়ে থাকে, যে অসুস্থ অথবা যার স্বামী বিদেশে গেছে, তাহলে রাজা (শাসক) তার নিরাপত্তা নিশ্চিত কোরবেন। যদি তার সম্পত্তি তার কোন বন্ধু বা আত্মীয় হরণ করে, তাহলে রাজা দোষীদের কঠোর শাস্তি দেবেন এবং সম্পত্তি ঐ নারীকে ফেরত দেবেন।" (মনুসংহিতা ৮/২৮-২৯)

উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে এসলামেরও কঠোর দণ্ডবিধি রয়েছে যেগুলি উল্লেখ কোরলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে তাই সেদিকে যাচ্ছি না। আমার উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ হচ্ছে, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই তাদের ধর্মে প্রবিষ্ট অসীম বিকৃত দেখে ধর্মবিদ্বেষী হোয়ে গেছেন। তাদেরকে বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষে আগত সনাতন ধর্মমত পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম যার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ এসেছে এসলাম। মূল ধর্ম একই। অতীতের গ্রন্থ বিকৃত হোয়ে যাওয়ায় নতুন অবতার নতুন গ্রন্থ এনেছেন কিন্তু তারা নতুন কোনো ধর্ম নিয়ে আসেন নি। নতুন ধর্ম সৃষ্টি কোরেছে মানুষ। একজন মোসলেমের ঈমানের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হচ্ছে পূর্বের সকল নবী রসুল ও তাঁদের উপর অবতীর্ণ কেতাবগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এই হিসাবে ভারতবর্ষে আগত যেসব অবতার, মহামানব ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মাঝে সত্যের আলোকচ্ছটা পরিদৃষ্ট হয় তাদের সকলের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য।

আধুনিকতার কুসংস্কার

রাকীব আল হাসান

ফতোয়ার ভয়ে গৃহকোণে থাকা
কু-সংস্কারের বোরকায় ঢাকা
ছিড়ে ফেল বিকৃত আবরণ
খুলে ফেল যত মিছে বন্ধন
মাসায়েলের ঐ কাঁদামাখা পথে
আর নয় পথ চলা।
এখন সময় হয়েছে নারীর সত্যের কথা বলা।

মুক্তির নামে যত নগ্নতা
বেহায়াপনার নাম স্বাধীনতা
চোখ ঝলসানো আলোর আঁধার
পশুবৃত্তির জয়জয়কার।
বিজ্ঞাপনের পোস্টারে তার অশ্লীল দেহভঙ্গি
কতটুকু দিয়ে কতটুকু নিল পশ্চিমা চৌরঙ্গী।

তুমি জেগে ওঠ, জাগাও সবার
বুঝে নাও আজ সব অধিকার
হক এসলাম এসেছে আবার
ভাঙবে সকল মিথ্যার দ্বার।
ছিড়ে ফেলো মিছে ফতোয়ার জাল
পশ্চিমারাও হোক বেসামাল তোমার অভ্যূদয়ে,
আসবে নতুন প্রভাত আবার নতুন সূর্যোদয়ে।

নব সভ্যতার তূর্যবাদক যামানার এমামের আবির্ভাব

রাকীব আল হাসান

ব্যক্তিজীবন:

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত বিশেষ কোরে মোসলেম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হোলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্যামান ১৫ শাবান ১৩৪৩ হেজরী মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। এমামুয্যামানের রোয়েছে এক কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন-ইতিহাস। তাঁর শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু ঘোস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। ছোট বেলা থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা 'বাঘ-বন-বন্দুক' (১৯৬৪) নামক বইটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সনে এমামুয্যামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য অর্থাৎ এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ নজরুল একাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। পরবর্তীতে তিনি সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই কোরে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামানের ভাবনা:

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন।